খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

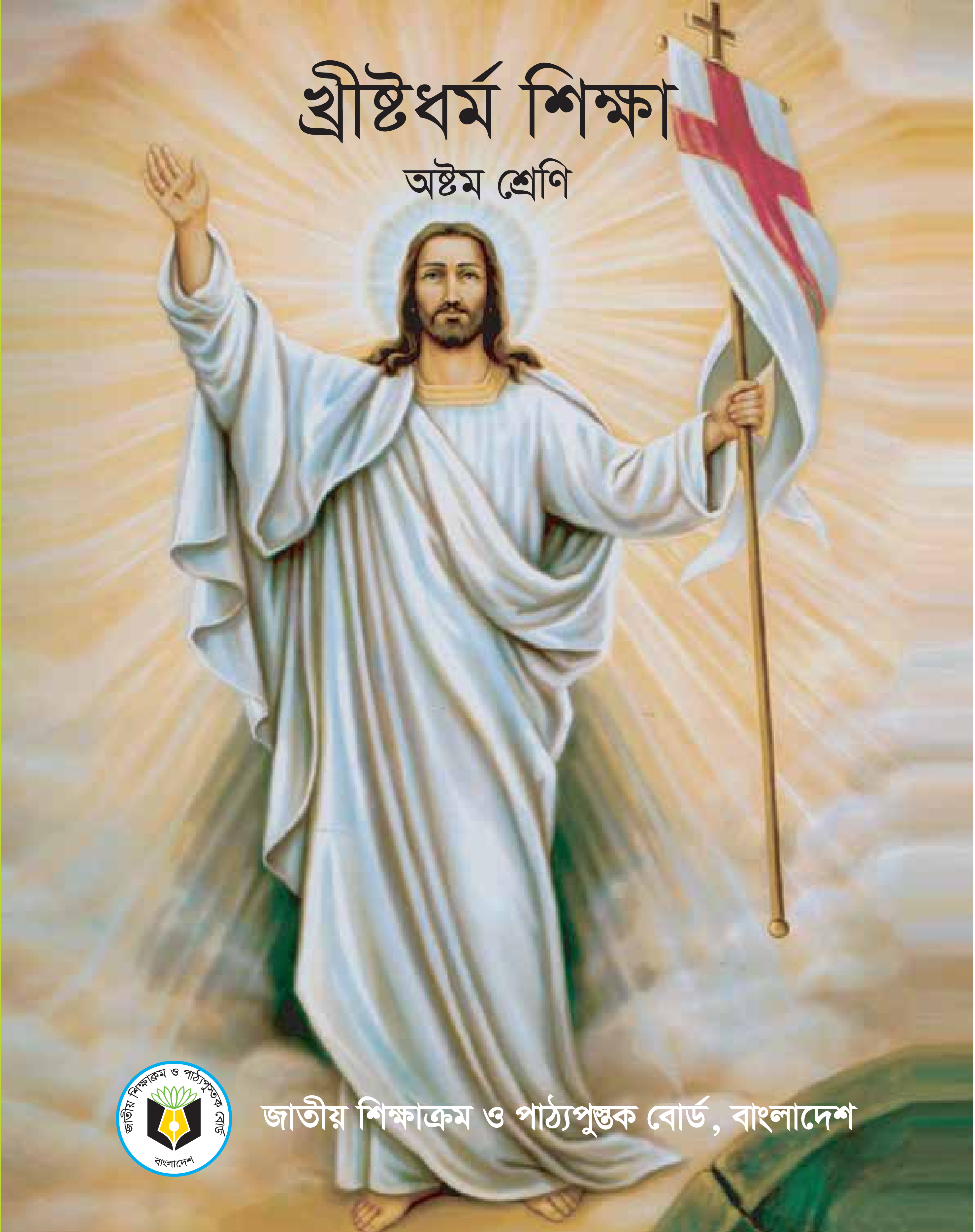

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ফাদার আদম এস. পেরেরা, সিএসসি
সিস্টার শিখা এল. গমেজ, সিএসসি
ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা, সিএসসি
ফাদার অসীম টি. গনসালভেস, সিএসসি
রবার্ট টমাস কস্তা

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি একুশ শতকের সূচনালগ্নে পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তনের পটভূমিতে পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত জীবনাহ্বান ও ঈশ্বর কর্তৃক আহূত ব্যক্তিদের আনুগত্য ও জীবনচরিত্র সন্নিবেশ করে রচনা করা হয়েছে। পরিত্রাতা যীশুর জীবন ও কাজগুলো জানা এবং তাঁর পরিত্রাণে বিশ্বাসী হয়ে নৈতিকতা আধ্যাত্মিকতা, সহনশীলতা, উদারতা ও অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ ও সাম্যের চেতনায় শিক্ষার্থীরা যাতে উজ্জীবিত হয়, সেইদিক বিবেচনায় রেখে পাঠ্যপুস্তকটি রচনা করা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	পবিত্র আত্মা	১-১১
দ্বিতীয়	ঈশ্বরের সৃষ্টির লালন	১২-২১
তৃতীয়	ঈশ্বর ও মানুষ	২২-৩১
চতুর্থ	মানুষের পতনের ফল	৩২-৪১
পঞ্চম	যীশুর বাণী প্রচারের মূলভাব	৪২-৫৩
ষষ্ঠ	যীশুর আহ্বানে পিতরের সাড়াদান	৫৪-৬৩
সপ্তম	যীশুর আশ্চর্য কাজ ও ঐশরাজ্য	৬৪-৭২
অষ্টম	খ্রীষ্টমণ্ডলী	৭৩-৭৮
নবম	ন্যায্যতা, শান্তি ও আত্মসংযম	৭৯-৯৪
দশম	ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী	৯৫-১০৮

প্রথম অধ্যায়

পবিত্র আত্মা

আমরা জানি যে, ঈশ্বর মাত্র একজন, কিন্তু এক ঈশ্বরে তিন ব্যক্তি আছেন। এই অধ্যায়ে আমরা পবিত্র আত্মা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব। পবিত্র আত্মা হলেন পবিত্র ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি। পবিত্র আত্মা পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন। তিনি পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বরেরই আত্মা। পবিত্র আত্মা জগতের শুরু থেকেই বিদ্যমান ছিলেন, এখনও আছেন এবং অনন্তকাল থাকবেন। পঞ্চাশত্তমী পর্বে তিনি শিষ্যদের ওপর অবতরণ করেছেন ও বিশ্বাসের শিক্ষক হওয়ার জন্য প্রেরিত শিষ্যদের শক্তি দান করেছেন। পবিত্র আত্মা হলেন সহায়ক আত্মা, যিনি আমাদের সকলকে পবিত্র রাখেন ও বিশ্বাসকে দৃঢ় ও পরিপক্ক করেন।

পবিত্র আত্মার অবতরণ

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- পবিত্র ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি পবিত্র আত্মা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- পঞ্চাশত্তমী দিনে প্রেরিত শিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মার অবতরণের ঘটনা বর্ণনা করতে পারব;
- পবিত্র আত্মার দান ও দানের ফলগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব;
- খাঁটি খ্রীষ্টীয় জীবন গঠনে পবিত্র আত্মার দানগুলোর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব;
- পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করব।

পাঠ ১ : পবিত্র আত্মার অবতরণ

যীশুর পুনরুত্থানের পঞ্চাশ দিন পর প্রেরিত শিষ্যেরা পবিত্র আত্মাকে লাভ করলেন। এই পঞ্চাশ দিন তাঁরা ভয়ে লুকিয়ে ছিলেন। একটি ঘরের মধ্যে তখন তাঁরা একসঙ্গে বাস করতেন। সেখানে তাঁরা একত্রে দিনরাত প্রার্থনা করে কাটিয়েছেন। কেউ বা আবার নিজ নিজ পেশায় ফিরে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছিলেন; কেউ কেউ জাল নিয়ে মাছ ধরতেও গিয়েছিলেন। শিষ্যদের সঙ্গে পুনরুত্থিত যীশু বেশ কয়েকবার দেখা দিয়েছিলেন। প্রথম অবস্থায় তাঁরা যীশুকে চিনতে পারেন নি কিন্তু পরে চিনতে পেরেছিলেন। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানে তাঁরা বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। প্রভু যীশু তাঁদের সাহস দিয়ে বলেছিলেন, "তোমরা ভয় পেয়ো না। আমি তোমাদের জন্য এক সহায়ক আত্মাকে পাঠিয়ে দেবো, তিনি তোমাদের সবকিছু স্মরণ করিয়ে দেবেন।"

খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের দশ দিন পর, পঞ্চাশত্তমীর দিনে শিষ্যেরা সকলে এক জায়গায় সমবেত রয়েছেন, এমন সময় হঠাৎ আকাশ থেকে শোনা গেল প্রচণ্ড বাতাস বয়ে যাওয়ার মতো একটা শব্দ। যে বাড়িতে তাঁরা বসে ছিলেন, সে বাড়িটি সেই শব্দে ভরে উঠল। তারপর তাঁরা দেখতে পেলেন, অগ্নিজিহ্বার মতো দেখতে কী যেন তাঁদের প্রত্যেকের মাথার উপর নেমে এসে অধিষ্ঠিত হলো। তাঁদের সকলেরই সারা অন্তরজুড়ে তখন বিরাজিত হলেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা। তাঁরা নানা বিদেশি ভাষায় কথা বলতে লাগলেন–পবিত্র আত্মা যাঁকে যেমন বাক্‌শক্তি তখন দিচ্ছিলেন, সেই মতোই।

আকাশতলের প্রতিটি দেশের বহু ভক্ত ইহুদি তখন যেরুসালেমে বাস করত। সেই শব্দ শোনা যাওয়ার সাথে সাথেই সেখানে ভিড় জমে গেল। তারা প্রত্যেকে নিজের নিজের ভাষায় শিষ্যদের কথা বলতে শুনে কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে, বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল : 'ওই যে, যারা কথা বলছে, ওরা সকলে কি গালিলেয়ার লোক নয়? তাহলে আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের মাতৃভাষায় ওদের যে কথা বলতে শুনছি, এটা কী করে সম্ভব হলো? আমাদের মধ্যে পার্থিয়া, মেদিয়া এবং এলামের লোক আছে; আছে মেসোপটেমিয়া, যুদেয়া আর কাপ্পাদোসিয়ার অধিবাসী এবং পন্তাস ও এশিয়া, ফ্রিজিয়া ও পাম্ফিলিয়া, মিশর এবং লিবিয়ার সাইরিনি অঞ্চলের লোক। তাছাড়া রোমের যেসব লোক এখানে এসে কিছু দিন ধরে রয়েছে, ইহুদি ও ইহুদি ধর্মাবলম্বী যারা জন্মসূত্রে বিজাতীয় হয়েও ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল, দুই-ই তারাও আছে এবং ক্রীট দ্বীপ ও আরব দেশের লোকেরাও আছে। অথচ আমরা সকলেই শুনতে পাচ্ছি, ওরা আমাদের নিজের নিজের ভাষায় পরমেশ্বরের মহান কর্মকীর্তি ঘোষণা করছে।' তারা সকলেই তখন স্তম্ভিত। কী যে ঘটছে, তা বুঝতে না পেরে, তারা একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করতে লাগল : 'এই ব্যাপারটার মানে কী?' কেউ কেউ আবার বিদ্রুপ করে বলতে লাগল, 'মিঠে মদ খেয়ে ওরা, দেখছি, নেশায় ভরপুর।'

কিন্তু পিতর তখন এগারোজন প্রেরিত দূতের সঙ্গে, সেখানে দাঁড়িয়ে সকলকে শুনিয়ে বলে উঠলেন, 'শোন, যুদেয়ার মানুষেরা, আর শোন তোমরাও সকলে, যারা এই যেরুসালেমে বাস করে থাক। এই ব্যাপারটা তোমাদের বোঝা চাই– আমার কথাগুলো তোমরা মন দিয়েই শোন। তোমরা এদের সম্বন্ধে যা ভাবছ, তা কিন্তু সত্যি নয়; এরা মোটেই মাতাল নয়। এখন তো সবে নয়টা। আসলে সেই ঘটনাই আজ ঘটল, যার কথা প্রবক্তা যোয়েল আগেই জানিয়েছিলেন' (প্রেরিত ২:১-১৬)।

এইভাবে শিষ্যেরা পঞ্চাশত্তমী দিনে পবিত্র আত্মাকে লাভ করলেন। উপস্থিত সকলে তাঁদের ভুল বুঝলেও তারা পবিত্র আত্মার প্রেরণায় শক্তি লাভ করে মানুষের ভুল শোধরাতে পেরেছিলেন। তাদের বোঝাতে পেরেছিলেন যে, শিষ্যেরা মাতাল ছিলেন না; বরং পবিত্র আত্মাকে লাভ করেছিলেন। পবিত্র আত্মার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে তাঁদের ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল। যে পিতর ভয়ে অন্য শিষ্যদের সাথে উপরের ঘরে ছিলেন, সেই পিতর সকলের সামনে দাঁড়িয়ে সাহসের সাথে ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর ভাষণে তিনি খ্রীষ্টকে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করার জন্য ইহুদিদের দায়ী করেছিলেন। পিতর এই সাহস পেয়েছেন পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের কাছ থেকে। কারণ তিনি সত্যময় আত্মা। সত্যকে প্রচার ও প্রকাশ করার জন্য তিনি সাধু পিতরকে প্রেরণা দিয়েছেন। সাধু পিতরের স্পষ্টভাবে সত্য কথা প্রচারের ফলে সেদিন বহু মানুষ দীক্ষাস্নান গ্রহণ করে পবিত্র আত্মাকে লাভ করেছিলেন।

কাজ : শিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মা নেমে আসার পর তাদের মধ্যে যেসব পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল সেগুলো তালিকাবদ্ধ করো।

পাঠ ২ : পবিত্র আত্মার প্রেরণা

আমাদের মধ্যে যারা দীক্ষাস্নান, খ্রীষ্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেছে, তারা জানে, এই সাক্রামেন্তগুলো কত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা পবিত্র আত্মাকে নতুন করে লাভ করেছি। আমরা পবিত্র আত্মার শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে উঠেছি। এই পবিত্র আত্মা সম্পর্কে আমরা এই অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব।

দীক্ষাস্নানে আমরা দীক্ষাদাতার দ্বারা ক্রুশের চিহ্নে চিহ্নিত হয়েছি। তাছাড়া আমরা প্রার্থনা বা কাজের শুরুতে ও শেষে নিজেদেরকে ক্রুশের চিহ্নে চিহ্নিত করি। আমরা স্মরণ করি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মাকে। ক্রুশের চিহ্নের মধ্য দিয়ে আমরা পবিত্র ত্রিত্বের রহস্যকে স্মরণ করি। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা মিলে যে এক ঈশ্বর, তাই হলো ত্রিত্বের রহস্য। এই রহস্যটি এমন একটি বিষয় যা আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারি না। যেটুকু বুঝতে পারি তা সম্ভব হয় গভীর বিশ্বাস, প্রার্থনা ও ভালোবাসার মাধ্যমে। কারণ পরমেশ্বর যে প্রেমস্বরূপ। এই ভালোবাসা পিতা ঈশ্বর সৃষ্টিকাজে, পুত্র ঈশ্বর পরিত্রাণকাজে এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর প্রেরণা ও সহায়তা দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

'প্রেরণা' শব্দটি পবিত্র আত্মার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। আভিধানিক অর্থে প্রেরণা হলো উৎসাহ, প্রবল উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা, প্রবৃত্তি বা বিশেষ কোনো কর্মসম্পাদনের জন্য মানুষের অন্তরের শক্তি। খ্রীষ্টধর্মে এই প্রেরণা হলো ঐশ বা দৈব শক্তি। এই শক্তি বা প্রেরণার উৎস হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও মহান সৃষ্টিকর্তা। তিনি সকল শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। তিনি এই বিশ্বজগতের প্রভু। সৃষ্টি থেকেই তিনি মানব মুক্তির মহাপরিকল্পনা করে রেখেছেন। এর ধারাবাহিকতায় তিনি পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। এই প্রকাশের উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন আত্মার মাধ্যমে শক্তি ও পুত্রের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করতে পারে।

সাধু ইরেনিয়াস বলেন, "দীক্ষাস্নান আমাদেরকে পুত্রের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার দ্বারা পিতা ঈশ্বরে নবজন্ম লাভের কৃপা দান করে। কারণ যারা ঈশ্বরের আত্মাকে লাভ করে তারা বাণী অর্থাৎ পুত্রের দিকে চালিত হয় এবং পুত্র তাদেরকে পিতার কাছে নিবেদন করেন, আর পিতা তাদের দান করেন অনশ্বরতা। আর পবিত্র আত্মার মাধ্যম ব্যতীত পুত্রকে দেখা অসম্ভব এবং পুত্রকে ছাড়া কেউই পিতার নিকট যেতে পারে না। কারণ পুত্র হচ্ছেন পিতা-সম্পর্কিত জ্ঞান এবং ঈশ্বর-পুত্রের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায় পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে।"

সাধু পল বলেন, পবিত্র আত্মার প্রেরণা ছাড়া কেউ বলতে পারে না যীশু 'প্রভু'(১ করি ১২:৩)। পবিত্র আত্মাই অন্তরে শক্তি বা প্রেরণা যোগান ঈশ্বরকে জানতে ও বিশ্বাসে দৃঢ় হতে। মানুষের অন্তরে এই পবিত্র আত্মাকে দান করেন স্বয়ং ঈশ্বর। দুর্বলচিত্তের মানুষ যেন ঈশ্বরের পানে ধাবিত হতে পারে তার প্রেরণা বা শক্তি পবিত্র আত্মাই জুগিয়ে দেন। তিনি মানুষের বিশ্বাসকে দৃঢ় করেন। তাই পবিত্র আত্মার সাথে মানুষের সম্পর্ক রাখতে হয়। এর মধ্য দিয়ে পুত্র ও পিতার কাছে যাওয়া যায়। কারণ পবিত্র আত্মার উৎপত্তি পিতার নিকট থেকে আর তার প্রকাশ পুত্রের মাধ্যমে। তাই পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে আমরা পিতা ও পুত্রের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি, বিশ্বাসে দৃঢ় হতে পারি এবং ত্রিত্ব ঈশ্বরের এই বিশ্বাসের রহস্যে আমরা বেড়েও উঠতে পারি।

খ্রীষ্টমণ্ডলীতে আমরা প্রথমে দীক্ষাস্নান সংস্কারের মাধ্যমে পবিত্র আত্মাকে লাভ করি। আদিপাপের কলুষতা থেকে মুক্ত হই, জীবন পাই, ঐশ কৃপা বা প্রসাদ পাই, বিশ্বাস গ্রহণ করি এবং ঈশ্বর সন্তান হিসেবে পরিচয় লাভ করি। এভাবে আমরা পবিত্র আত্মায় নবজন্ম লাভ করি। হস্তার্পণ সংস্কারের মাধ্যমে পবিত্র আত্মাকে পূর্ণাঙ্গভাবে লাভ করি। ফলে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে আমরা খ্রিষ্ট সম্বন্ধে জানতে পারি। পবিত্র আত্মাই আমাদের অন্তরে সেই আলো জ্বালিয়ে দেন যেন আমরা খ্রিষ্টকে জানতে পারি ও বিশ্বাসে দৃঢ় হতে পারি।

বিশ্বাস মন্ত্রে আমরা স্বীকার করি যে আমরা 'পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি।' তার অর্থ হলো আমরা পবিত্র আত্মাকে এক ঈশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে বিশ্বাস করি। তিনি পিতা ও পুত্রের আত্মা এবং

আদি থেকেই বিদ্যমান। তিনি পিতা ও পুত্রের সাথে সমভাবে পূজিত ও গৌরবান্বিত। মানবজাতির মুক্তি পরিকল্পনায় তিনি পূর্ব থেকেই পিতা ও পুত্রের সাথে সক্রিয়।

শিষ্যদের উপর অবতরণের মধ্য দিয়ে তিনি একজন ব্যক্তি হিসেবে মণ্ডলীতে উপস্থিত। তিনি সর্বদা আমাদের প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছেন যেন আমরা সত্য পথে পরিচালিত হতে পারি। পবিত্র আত্মার দেওয়া প্রেরণাতেই আমরা ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকতে এবং যীশুকে মুক্তিদাতা বলে স্বীকার করতে পারি। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে জীবনযাপন করতে পবিত্র আত্মাই আমাদের জন্য শক্তি ও সাহস জোগান। তিনিই আমাদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট, বিপদআপদ ও পরীক্ষা প্রলোভনে বিশ্বাসে অটল থাকার শক্তি দেন। তিনিই আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ-বিভেদের স্থলে একতা, শান্তি ও ন্যায্যতা স্থাপন করেন।

পাঠ ৩ : পবিত্র আত্মার দান ও ফল

ঈশ্বর আমাদের বিভিন্ন জনকে ভিন্ন ভিন্ন দান বা শক্তি দিয়েছেন। তাঁর এই দান দ্বারা আমরা নিজেদের বুঝতে পারি ও সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারি। তাঁর এই দানে আমরা আধ্যাত্মিকভাবে বৃদ্ধি পাই, মানবিকভাবে গঠিত হই, মণ্ডলী ও সমাজে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হই এবং ঈশ্বরের মনোনীত বা আপনজন হয়ে উঠি।

অনুরূপভাবে পরস্পরের মঙ্গল সাধনের জন্য ঈশ্বর আমাদের বিভিন্ন সেবাকাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। যেমন মঙ্গলবাণী ঘোষণা করা, রোগীদের সুস্থ করা, পাপীদের সৎপথে ফিরিয়ে আনা এবং এরকম আরও বিভিন্ন কাজ। এসব সেবাকাজের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সাথে আধ্যাত্মিকভাবে যুক্ত থাকি। তাছাড়া আমরা একে অপরের সাথে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকি এবং ভালোবাসা ও সেবার মানুষ হয়ে উঠি। এগুলো সবই মানুষের অন্তরে দান করেন পবিত্র আত্মা। এক একজনের অন্তরে এক একভাবে পবিত্র আত্মা নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন।

পবিত্র আত্মার বারোটি ফল

সাধু পল বলেন, "নানা দিব্য দান আছে, তবে যিনি তা দিয়ে থাকেন সেই পবিত্র আত্মা কিন্তু এক। নানা সেবাকর্মও আছে, তবে যাঁকে সেবা করা হয় সেই প্রভু কিন্তু এক। নানা কর্মক্রিয়াও আছে, তবে সকলের অন্তরে সবকিছুই যিনি করে থাকেন, সেই পরমেশ্বর কিন্তু এক। ঐশ আত্মাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রত্যেককে দেওয়া হয় সকলেরই মঙ্গলের জন্যে। একজনকে পবিত্র আত্মা দান করেন প্রজ্ঞার ভাষা, আর একজনকে সেই পবিত্র আত্মাই দান করেন ধর্মজ্ঞানের ভাষা; অন্য একজনকে দান করেন পরম বিশ্বাস। কাউকে আবার সেই একই আত্মা দান করেন রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা, কাউকে নানা অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা, কাউকে প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করার ক্ষমতা, কাউকে নানা আত্মিক শক্তির স্বরূপ বিচার করার ক্ষমতা, কাউকে নানা অজ্ঞাত ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা এবং অন্য কাউকে আবার সেই সব ভাষা বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা। কিন্তু এই সমস্ত কিছুই সেই এক ও অদ্বিতীয় আত্মারই কাজ; তাঁর আপন ইচ্ছামতো তিনি এক একজনকে এক এক বিশেষ শক্তি দিয়ে থাকেন।

"তুলনা করে বলা যেতে পারে: আমাদের দেহ এক, অথচ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক। দেহের অঙ্গগুলো অনেক হয়েও সব কয়েকটি মিলে এক দেহ-ই হয়। খ্রীষ্টও ঠিক তেমনি। কারণ একই পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমরা সকলেই দীক্ষাস্নাত হয়ে একই দেহের অঙ্গ হয়ে উঠেছি–তা আমরা ইহুদি বা অইহুদি, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ, যা-ই হই না কেন; এবং সেই একই আত্মার উৎস থেকে আমাদের সকলকেই পান করতে দেওয়া হয়েছে। দেহ কেবলমাত্র একটি অঙ্গ নিয়ে নয়, অনেক অঙ্গ নিয়েই গঠিত" (১ করি ১২:৪-১৪)।

একই পত্রে সাধু পল আরও বলেন, "এখন, তোমরা সবাই মিলে খ্রীষ্টেরই দেহ; তোমরা এক একজন সেই দেহের এক একটি অঙ্গ। পরমেশ্বর মণ্ডলীতে যাঁদের বিশেষ পদে বসিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমে আছেন প্রেরিত দূতেরা, তারপর প্রবক্তারা, তারপর শিক্ষাগুরুরা, তারপর রয়েছেন তাঁরাই, যাঁদের তিনি দিয়েছেন নানা অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা বা রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা, কিংবা পরকে সাহায্য করার বিশেষ গুণ বা তাদের পরিচালনা করার বিশেষ ক্ষমতা, অথবা নানা অজ্ঞাত ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা" (১ করি ১২:২৭-২৮)।

পবিত্র ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি পবিত্র আত্মা হলেন মানুষের নিকট পিতা ও পুত্রের দান। তাঁকে ঈশ্বরের প্রাণবায়ুও বলা হয়। এই পবিত্র আত্মাকে লাভ করেই প্রেরিত শিষ্যেরা নতুন জীবন পেয়েছিল, তাদের সমস্ত ভয়ভীতি দূর হয়েছিল। ফলে তারা সাহসের সঙ্গে পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের সাক্ষ্য বহন করেছিলেন। পবিত্র আত্মার সাতটি দান বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে। এই দানগুলোকে সাতটি নামে উল্লেখ করা যায়।

পবিত্র আত্মার সাতটি দান

(১) প্রজ্ঞা (২) বুদ্ধি (৩) বিবেক (৪) মনোবল (৫) জ্ঞান (৬) ধর্মানুরাগ ও (৭) ঈশ্বর-ভীতি। গালাতীয়দের কাছে পত্রে সাধু পল বলেন, "কিন্তু পবিত্র আত্মা যে-ফসল ফলিয়ে তোলেন, তা হলো:

ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা আর আত্মসংযম। এমন-সব গুণের বিরুদ্ধে কোনো বিধান থাকতেই পারে না।" (গালাতীয় ৫:২২-২৩)।

আমাদের জ বন ও চরিত্রের সমস্ত ভালো কিছু কিংবা সকল সৌন্দর্য, আমাদের জীবনে যা কিছু খ্রীষ্টময় সবই পবিত্র আত্মার কাজ। এর সবই আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার ফল। তিনি আমাদের প্রেরণা জোগান যেন আমরা বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত হতে পারি। ভালোবাসা, আনন্দ ও শান্তিতে পরিপ্লুত হই। সাধু পল গালাতীয়দের কাছে তাঁর কথাগুলোর মধ্য দিয়ে একথাই প্রকাশ করেছেন। রোমীয়দের কাছে পত্রের বিভিন্ন জায়গায় তিনি এই একই ফলের কথা বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত ফলগুলো কত সুন্দর, কতই না মধুর! এগুলো কে না চায়! এরূপ ফলে ফলশালী হতেও বা কে না চায়! এ যেন খ্রীষ্টময় হয়ে উঠা, যেন স্বর্গের নাগরিক হয়ে উঠা! আমরা তো এই ফলগুলোর জন্যই প্রত্যাশী। এই ফলগুলো পাই একমাত্র পবিত্র আত্মারই ফলে।

সাধু পিতর বলেন, "তাই তোমাদেরও আপ্রাণ চেষ্টা করে এখন তোমাদের ভগবদবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে সচ্চরিত্রতা, তেমনি, সচ্চরিত্রতার সঙ্গে সদ্‌জ্ঞান, সদ্‌জ্ঞানের সঙ্গে আত্মসংযম, আত্মসংযমের সঙ্গে নিষ্ঠতা, নিষ্ঠতার সঙ্গে ধর্মশীলতা, ধর্মশীলতার সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রেম, আর ভ্রাতৃপ্রেমের সঙ্গে সর্বজনে ভালোবাসা।" (২ পিতর ১:৫-৭)।

আমাদের জীবনে চরিত্র গঠনের জন্য আমরা নিজের শক্তিতে কাজ করতে পারি না : যদি না পবিত্র আত্মাকে আমাদের জীবনে কাজ করতে দেই। সাধু পিতর তাঁর পত্রের মাধ্যমে আমাদের আহ্বান জানান আমরা যেন আপ্রাণ চেষ্টা করি এই গুণগুলোকে আমাদের জীবনে ফলশালী করতে। এর জন্য আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে পবিত্র আত্মার কৃপা ও দয়ার উপর। কারণ পবিত্র আত্মাই আমাদের জীবনে প্রেরণা যোগান ধর্মের পথে চলতে।

আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার বারোটি ফল আছে।

(১) ভ্রাতৃপ্রেম (২) আনন্দ (৩) শান্তি (৪) সহিষ্ণুতা (৫) করুণা (৬) সৌজন্য (৭) ধৈর্য (৮) মৃদুতা (৯) বিশ্বস্ততা (১০) লজ্জাশীলতা (১১) সংযম ও (১২) বিশুদ্ধতা।

কাজ : পবিত্র আত্মার দান ও ফলগুলো একে একে মুখস্থ বল ও খাতায় লেখো।

পাঠ ৪ : পবিত্র আত্মা সহায়ক

মুক্তির ইতিহাসে পবিত্র আত্মার প্রকাশ বিভিন্নভাবে হয়েছে। সৃষ্টির শুরু থেকেই পবিত্র আত্মা পিতার প্রাণবায়ু হিসেবে ছিলেন। এ জগতে ভালোমন্দ বিচার বিশ্লেষণ করার উপায় পবিত্র আত্মাই মানুষকে

দিয়েছেন। বিভিন্ন ঘটনায় প্রবক্তা, বিচারক বা রাজাদের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা কথা বলেছেন। পবিত্র আত্মারই প্রভাবে মারীয়া গর্ভবতী হয়েছিলেন। দীক্ষাগুরু যোহনের মাধ্যমে পবিত্র আত্মাই মানুষকে মন পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এরূপ যা যা ঘটেছে সবস্থানেই পবিত্র আত্মার প্রকাশ ঘটেছে।

পবিত্র আত্মাকে দেখা যায় না। যুক্তিতর্ক দিয়ে পবিত্র আত্মাকে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু পবিত্র আত্মার উপস্থিতি এবং পবিত্র আত্মার কাজ সবই দৃশ্যমান। কারণ তিনি সত্যময় আত্মা। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা সত্যকে জানতে পারি।

পবিত্র আত্মা বিভিন্ন নামে পরিচিত। প্রভু যীশু পবিত্র আত্মাকে 'সহায়ক' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তার অর্থ হলো 'যিনি কারও পক্ষে থাকার জন্য আহূত।' এ জগৎ ছেড়ে পিতার কাছে যাবার আগে যীশু তাঁর শিষ্যদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি একজন সহায়ক আত্মাকে প্রেরণ করবেন। তিনি তাঁদের সাথে সাথে থাকবেন ও তাঁদের পরিচালিত করবেন। যীশুর কথামতো তাই ঘটল। পঞ্চাশত্তমীর দিনে সহায়ক আত্মা শিষ্যদের উপর অবতরণ করলেন। তাঁদের সান্ত্বনা ও শক্তি দিলেন। তাই পবিত্র আত্মা হলেন সান্ত্বনাদাতা। আসলে প্রভু যীশু নিজেই প্রথম সান্ত্বনাদাতা। তিনি শিষ্যদের একা থাকতে দিলেন না। তাঁদের ছত্রভঙ্গ হতে দিলেন না। বরং তাঁদেরকে একত্রিত থাকতে সাহায্য করলেন এবং তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন।

পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন গ্রন্থে বিশেষভাবে সাধু পল ও পিতরের পত্রাবলিতে পবিত্র আত্মাকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে যেমন প্রতিশ্রুত আত্মা, খ্রীষ্টের আত্মা, প্রভুর আত্মা এবং ঈশ্বরের আত্মা। প্রভুর আত্মার উপস্থিতি মণ্ডলীতে আমরা বিভিন্নভাবে দেখে থাকি। বিভিন্ন সাক্রামেন্তে আমরা পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ও তাঁর কাজ বিশ্বাস করি। বিভিন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে যেমন জল, তেল লেপন, আগুন, মেঘ ও আলো; তাছাড়া মুদ্রাঙ্কন, হস্ত, অঙ্গুলি ও কবুতর এগুলোর মধ্যে আমরা পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ও কাজ বিশ্বাস করি। এগুলোর মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার প্রকাশ ও কৃপা নিত্য বর্ষিত হয়। এই পবিত্র আত্মাই আমাদের নিত্য সহায়ক ও সান্ত্বনা, যিনি সর্বদা মানুষকে সত্যের পথে পরিচালিত করেন।

কাজ : জোড়ায় জোড়ায় আলাপ করে পবিত্র আত্মাকে সান্ত্বনাদাতা বলার কারণ খুঁজে বের করো।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো

১. পবিত্র আত্মা হলেন পবিত্র ত্রিত্বের ... ব্যক্তি ।

২. প্রথম অবস্থায় তাঁরা ... চিনতে পারেননি কিন্তু পরে চিনতে পেরেছিলেন ।

৩. আকাশতলের প্রতিটি দেশের বহু ভক্ত ইহুদি তখন ... যেরুসালেমে বাস করত ।

৪. 'প্রেরণা' শব্দটি পবিত্র আত্মার সঙ্গে ... জড়িত ।

৫. ঈশ্বর আমাদের বিভিন্ন জনকে ভিন্ন ভিন্ন দান বা ... দিয়েছেন ।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো

বাম পাশ	ডান পাশ
১. পবিত্র আত্মা পিতা ঈশ্বর ও	• তিনি সাধু পিতরকে প্রেরণা দিয়েছেন
২. একটি ঘরের মধ্যে তখন	• তাদের ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল
৩. পবিত্র আত্মার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে	• পুত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন
৪. সত্যকে প্রচার ও প্রকাশ করার জন্য	• তাঁরা এক সঙ্গে বাস করতেন
৫. যীশু সকল শক্তি ও	• মহাপরিকল্পনা করে রেখেছেন
	• ক্ষমতার উৎস

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পবিত্র আত্মা পবিত্র ত্রিত্বের কততম ব্যক্তি–

ক. প্রথম খ. দ্বিতীয়

গ. তৃতীয় ঘ. অদ্বিতীয়

২. কীভাবে প্রেরিত শিষ্যরা মানুষের ভুল শোধরাতে পেরেছিলেন?

ক. পবিত্র আত্মার প্রেরণায় খ. নিজ শক্তি বলে

গ. বাণী প্রচারের অনুপ্রেরণায় ঘ. নিজের প্রেরণায়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

পড়ালেখা শেষে নিবিড় একটি বায়িং অফিসে ক্যাশিয়ার পদে কাজে যোগ দেয়। সে নিয়মিত কাজে যায়। তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সে যথাযথভাবে পালন করে। অন্য অনেক কর্মী তাকে অর্থের লোভ দেখিয়ে মন্দ কাজের প্রস্তাব করলে সে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কারণ এ ব্যাপারে সে ছোটবেলা থেকেই তার পরিবারের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে।

৩. কার ইচ্ছায় নিবিড় পরিচালিত হয়?

ক. ভাববাদীগণের খ. বন্ধুবান্ধবদের

গ. পবিত্র আত্মার ঘ. শিক্ষকদের

৪. নিবিড়ের এ ধরনের কাজ সাধারণ মানুষকে করে তুলতে পারে–

i. আধ্যাত্মিকতায় বলীয়ান

ii. মানবিকভাবে সুগঠিত

iii. ঈশ্বরের আপনজন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পবিত্র হৃদয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইমিগ্রেশন ভিসা নিয়ে আমেরিকা চলে গেলেন। এবার বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি বিশপ মহোদয় ঐ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক সেবাস্টিয়ানকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিতে বলেন। বিদ্যালয়টি স্থানীয় প্রভাবশালীদের কারণে খুবই বিশৃঙ্খল অবস্থায় চলছিল। এমতাবস্থায় তিনি বিদ্যালয় প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি আতঙ্কিত ছিলেন। তিনি বাড়ি গিয়ে ঈশ্বরের নিকট শক্তি প্রার্থনা করেন এবং ঈশ্বরের নিকট থেকে তিনি তার প্রার্থনায় সাহস ও অনুপ্রেরণা পান। এজন্যে পরের দিন তিনি প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার সম্মতি জানিয়ে বিশপ মহোদয়ের নিকট পত্র দিলেন।

ক. পঞ্চাশত্তমী পর্বে কে শিষ্যদের উপর অবতরণ করেন?

খ. যীশুর প্রেরিত শিষ্যরা বিদেশি ভাষায় কথা বলতে লাগলেন কেন?

গ. সেবাস্টিয়ানের কাজে পবিত্র আত্মার কোন দানটি ফুটে উঠেছে–ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সেবাস্টিয়ানের কাজের মধ্যে পবিত্র আত্মার সব কয়টি ফলই বিদ্যমান আছে বলে কি তুমি মনে কর–তোমার যুক্তি প্রদর্শন করো।

২. কৃষ্ণনগর ধর্মপল্লির খুব বিখ্যাত দুইজন লোক হলেন রমণ বর্মণ এবং প্যাট্রিক গমেজ। রমণ বর্মণ খুবই ধর্মভীরু এবং উত্তম প্রচারক। তার আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হয়ে অনেক লোক তার বুদ্ধি পরামর্শ নিয়ে উপকৃত হয়। তিনি সর্বদা মানুষকে সৎপথে পরিচালিত হতে উৎসাহিত করেন। তিনি রোগীদের আরোগ্যলাভের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন এবং তাদের সেবা দেন। রমণের পাশাপাশি প্যাট্রিক গমেজও সমাজের নেশাগ্রস্ত এবং বিপথগামী লোকদেরকে নানাভাবে ভালো কাজের পরামর্শ দিয়ে সুপথে ফিরিয়ে আনেন এবং তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেন।

ক. কারা যেরুসালেমে বাস করত?

খ. আমরা পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি কেন?

গ. রমণ বর্মণ কিসের প্রেরণায় তার কাজ পরিচালনা করেন–ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'রমণ বর্মণ ও প্যাট্রিক গমেজ তাদের ভালো কাজের ক্ষমতা একই ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছে'–উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পবিত্র ত্রিত্ব বলতে কী বোঝায়?

২. প্রেরিত শিষ্যরা কীভাবে পবিত্র আত্মাকে লাভ করেন?

৩. আমরা কীভাবে ক্রুশের চিহ্নে চিহ্নিত হয়েছি?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. পবিত্র ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি পবিত্র আত্মা সম্পর্কে বর্ণনা করো।

২. পঞ্চাশত্তমী দিনে প্রেরিত শিষ্যদের উপর আত্মা অবতরণের ঘটনা বর্ণনা করো।

৩. পবিত্র আত্মার দান ও দানের ফলগুলো ব্যাখ্যা করো।

২০২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরের সৃষ্টির লালন

ঈশ্বর তাঁর নিপুণ হাতে মহাবিশ্বের সমস্ত কিছু অত্যন্ত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সকল সৃষ্টিই অতি উত্তম। আর মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে। মানুষকে দিয়েছেন সকল সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব করার অধিকার। ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থেকে সৃষ্টিকে ভালোবেসে তার যত্ন নেওয়া মানুষের দায়িত্ব। দায়িত্ব পালনই ঈশ্বরের প্রতি তার আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করে। এভাবেই তার মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে এবং সে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিতে পারে।

ঈশ্বর সবকিছু অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- ঈশ্বরের সৃষ্টির সেবাযত্ন ও সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা ও উপায় বর্ণনা করতে পারব;
- সৃষ্টিকে ভালোবাসা ও যত্ন করার মাধ্যমে কীভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসা ও সেবা করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- দূষণের হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে আগ্রহী হব।

পাঠ ১ : সৃষ্টির লালন ও সংরক্ষণ

মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের সৃষ্টির রহস্য গুরুত্বপূর্ণ। আগে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জেনেছি। ঈশ্বর মহাবিশ্বের সমস্ত কিছু সৃষ্টি করে জগতে পূর্ণতা দিয়েছেন। তিনি সৃষ্টিকর্তা এবং সর্বশক্তিমান। তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। তাঁর সৃষ্টিকর্মের পিছনে ছিল মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা।

তাঁর সকল সৃষ্টিই উত্তম। আমরা এই বিষয়ে আগে বিশদভাবে জানতে পেরেছি। মানুষ হলো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, অতি উত্তম। মানুষকে তিনি দিয়েছেন সমস্ত সৃষ্টির উপর আধিপত্য করার ক্ষমতা। ঈশ্বর যখন মানুষের জন্য সবকিছু উত্তম করে সৃষ্টি করলেন, তখন সেগুলোর যত্ন তো আমাদের অবশ্যই নিতে হবে। কারণ এটা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

বর্তমান বাস্তবতায় আমরা সৃষ্টির সেই উত্তমতাকে হারিয়ে ফেলছি। তাই ঈশ্বরের সৃষ্টিকে যত্ন ও রক্ষা করার উপায় জানার পূর্বে আমাদের জানা দরকার কীভাবে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং কীভাবে ঈশ্বরের সৃষ্টির উত্তমতা ধ্বংস হচ্ছে।

কাজ : ঈশ্বরের সৃষ্টি দূষিত হওয়ার ৫টি কারণ লেখো।

পাঠ ২ : পরিবেশ দূষণ

ঈশ্বরের সৃষ্টির উত্তমতা দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টি প্রতিনিয়ত ধ্বংস হচ্ছে। ফলে সৃষ্টির সৌন্দর্য বিনষ্ট হচ্ছে। তার একটি অন্যতম কারণ হলো মানুষের পাপ। বিশেষত মানুষের স্বার্থপরতার ফলে সৃষ্টির সৌন্দর্য কলুষিত হচ্ছে। সেই মানুষেরই জন্য আজ দূষিত হচ্ছে সৃষ্ট প্রকৃতি ও ধরিত্রী। আমাদের আলোচনা থেকে এর অনেক কারণ আমরা খুঁজে পাই।

নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী কেনিয়ার ওয়ানগারি বলেছেন, "ঈশ্বর যদি মানুষকে প্রথম দিনই সৃষ্টি করতেন, অন্যান্য সৃষ্টির সেবা-যত্ন না পেয়ে সে পরের দিনই মরে যেত।" এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি। আমরা অনেক সময় এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিই না। এর কারণ হলো, আমরা উপলব্ধি করতে পারি না কীভাবে সৃষ্টি আমাদের যত্ন নিচ্ছে। তাই সৃষ্টিকে যেমন খুশি তেমনভাবে ব্যবহার করছি। নিজের স্বার্থে সৃষ্টির অপব্যবহার করছি।

সৃষ্টির সেই প্রথম যুগে ঈশ্বর ও মানুষের সাথে এবং মানুষ ও সৃষ্টির সমস্ত কিছুর সাথে সুন্দর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। মানুষের পাপের কারণে সেই মিলনে বিচ্ছিন্নতা এসেছে (আদি ৩:১৪-২৩)। অবাধ্যতা ও স্বেচ্ছাচারিতার ফলে মানুষ এদেন উদ্যান থেকে বিতাড়িত হয়েছে; মানুষের জীবনে পাপ নেমে এসেছে। এক ভাই আর এক ভাইকে হত্যার ফলে ঈশ্বরের সৃষ্টি কলুষিত হয়েছে। ফলে সৃষ্ট ভূমি হয়েছে রক্তসিক্ত ও অভিশপ্ত।

যুগ যুগ ধরে ভোগ-বিলাসিতা, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপর মনোভাবের জন্য মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্বকলহ লেগেই আছে। ধর্মের অপব্যবহার ও জাতিগত দ্বন্দ্বের ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহ বর্তমান যুগের নিত্য ঘটনা। ফলে ঝরে যাচ্ছে অগণিত তাজা প্রাণ, ধরিত্রী আর সমগ্র বিশ্বের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।

ঈশ্বর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছেন। অথচ শিল্পায়নের ফলে প্রকৃতির আজ কোনো বিশ্রাম নেই। বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্যের উপর অবর্ণনীয় হস্তক্ষেপ। ভূমি, জল, বায়ু প্রতিনিয়ত শোষিত ও নির্যাতিত হচ্ছে। এগুলোর অপব্যবহার ও অবৈধ নিয়ন্ত্রণের ফলে দূষিত হচ্ছে প্রকৃতি। পরিবেশ হচ্ছে অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা। দূষিত হচ্ছে আবহাওয়া। পরিবর্তিত হচ্ছে বিশ্বের জলবায়ু ও আবহাওয়া। উত্তপ্ত হচ্ছে বিশ্ব, উষ্ণ আবহাওয়া হচ্ছে অসহনীয়। ফলে প্রকৃতিতে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে। শীতের সময় তাপমাত্রা সহনীয় মাত্রা থেকে অতি নিচে আবার গরমের সময় অতি উর্ধ্বে বিরাজ করছে।

নির্বিচারে বৃক্ষ নিধনের ফলে বন হয়ে যাচ্ছে পশুপাখির বসবাসের অযোগ্য। নদনদী ভরাট ও নদীতে বিষাক্ত পদার্থ নিক্ষেপে মাছ ও জলজ প্রাণী ধ্বংস হচ্ছে। আণবিক বোমা ও বিষাক্ত গ্যাস দূষিত করছে বাতাস। ফলে বাতাস ভারী হয়ে আসছে। এর ফলে প্রতিনিয়ত আসছে প্রলয় ও ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ। মানুষের উপর নেমে আসছে প্রাকৃতিক দুর্দশা ও শাস্তি। মানুষ পতিত হচ্ছে মৃত্যুমুখে।

বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড বেড়ে গিয়েছে। ফলে বিগত কয়েক বছরে চীন ও পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধস হয়েছে, রাশিয়ায় খরা হয়েছে, ব্রাজিলে দাবানল হয়েছে, জাপান ও ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্প ও সুনামি হয়েছে। এসব প্রাকৃতিক বৈরিতা কেড়ে নিয়েছে অগণিত মানুষের প্রাণ।

পরিবেশবাদীদের মতে বাংলাদেশ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল সমুদ্র গভীরে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ইতিমধ্যে বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিভিন্নভাবে বাংলাদেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন, অসময়ে খরা, অসময়ে বন্যা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি, ক্ষতিকর পোকামাকড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি, ভূমিধস ইত্যাদি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে খাবার পানির সংকট দেখা দিচ্ছে। পুষ্টিহীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বিভিন্ন রোগ দেখা দিচ্ছে। এসব প্রাকৃতিক বৈরিতা ও দুর্যোগের ফলে বাংলাদেশে দরিদ্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কেনিয়ার ওয়ানগারির কথাটিতে আমরা আবার ফিরে যেতে পারি, "ঈশ্বর যদি মানুষকে প্রথম দিনই সৃষ্টি করতেন, তবে অন্যান্য সৃষ্টির সেবা-যত্ন না পেয়ে মানুষ পরের দিনই মরে যেত।" সৃষ্টিকে যত্ন নেওয়া মানুষের একটি দায়িত্ব। কারণ সৃষ্টিও মানুষের যত্ন নেওয়ার জন্যই সৃষ্ট। সৃষ্টির সেই সেবা পাওয়ার কারণেই মানুষকে সৃষ্ট সমস্ত কিছুর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা ও কৃতজ্ঞ থাকা এবং তার যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

২০২৫

কাজ : ঈশ্বরের সৃষ্টিকে তুমি কীভাবে যত্ন করতে পার, তার ৫টি উপায় লেখো।

পাঠ ৩ : পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা

পরিবেশ দূষণের ফলে ঈশ্বরের অপরূপ সৃষ্টি প্রতিনিয়ত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এর জন্যে মানুষ নিজেই দায়ী। মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাই ঈশ্বরের সৃষ্টির উত্তমতাকে ঝুঁকিমুক্ত করতে হবে, টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। আর এই কাজটি করা প্রতিটি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। সৃষ্টিকে যত্ন ও সংরক্ষণ করে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করতে হবে। এর কয়েকটি উপায় আমরা নিজেরাও খুঁজে পেতে পারি। সৃষ্টিকে যত্ন ও রক্ষা করার কয়েকটি উপায় বর্ণনা করা হলো।

১। প্রকৃতির জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল শক্তি। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে মানুষ আজ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। অনেক নতুন নতুন বিষয় মানুষ আবিষ্কার করছে। কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই উদ্ভাবনের পিছনে প্রকৃতিই মানুষকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। প্রকৃতিই মানুষকে তথ্য-উপাত্ত জুগিয়েছে। প্রকৃতিই মানুষকে জ্ঞান ও শক্তি দিয়েছে। প্রকৃতি থেকে জ্ঞান নিয়েই মানুষ নতুন নতুন সৃষ্টি করতে পেরেছে। মানুষের এই জ্ঞান প্রকৃতিরই জ্ঞান। মানুষ যখন এই সত্য উপলব্ধি করতে পারবে তখনই তারা প্রকৃতিকে ভালোবাসতে ও রক্ষা করতে শিখবে।

২। এরূপ প্রতিনিয়ত শিল্প কারখানা নির্মাণ করে বনবাদার উজাড় করে মানুষ প্রকৃতিকে ক্ষত-বিক্ষত করছে। শিল্পায়নের ফলে প্রকৃতির বিশ্রাম নেই। সুতরাং সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে প্রকৃতি। শিল্পায়নের জন্য সমস্ত কাঁচামাল যোগান দিতে হচ্ছে, প্রকৃতি থেকেই। ফলে ভূমি, জল ও বায়ু দূষিত হচ্ছে। পরিবেশ হচ্ছে অপরিচ্ছন্ন ও কলুষিত। আবহাওয়া হচ্ছে উত্তপ্ত ও অসহনীয়। এই বাস্তবতা যখন মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে তখনই সৃষ্টির প্রতি অত্যাচার ও অবিচার বন্ধ করা সম্ভব হবে।

৩। বর্তমান বাস্তবতায় মানুষ স্বার্থপর ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তারা যে কোনো মন্দ কাজ করতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না। অন্যের ক্ষতি হচ্ছে, সম্মানহানি হচ্ছে সেদিকে তাকাবার সময় মানুষের নেই। জায়গা-জমি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা চলছে। নিরীহ মানুষ বিভিন্নভাবে হয়রানি হচ্ছে। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্ত্রাস, বোমাবাজি ও খুন-খারাবি বৃদ্ধি পাচ্ছে। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। ছোট পরিবার আরও ছোট হচ্ছে। আবার ছোট পরিবারও ভেঙে মানুষ একাকী জীবনযাপন করছে। পারিবারিক বন্ধন, স্নেহ-মায়া, দরদ ও ভালোবাসা হারিয়ে যাচ্ছে। সমাজ ও পরিবারে পরস্পরের প্রতি ন্যায্যতা, মর্যাদা, আস্থা, দয়া ও ভালোবাসা ফিরিয়ে আনতে হবে। ধর্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঠিক ব্যবহার করতে হবে। তবেই সৃষ্টির সৌন্দর্য সুন্দরতর হয়ে উঠবে।

৪। প্রকৃতি-নির্ভর দরিদ্রদের প্রতি সাহায্যের মনোভাব বৃদ্ধি করতে হবে। পৃথিবীতে এখনও অনেক মানুষ আছে যারা প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। প্রকৃতি থেকেই তারা খাদ্য আহরণ করে। প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই কৃষিকাজ করে। আবার এই প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু ধনী ও লোভী শিল্পপতিদের ব্যক্তিস্বার্থে আজকাল প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। দখল হয়ে যাচ্ছে দরিদ্রদের শেষ সম্বলটুকু। বিতাড়িত হচ্ছে তারা প্রকৃতি থেকে। প্রকৃতিও আর স্বাভাবিক গতিতে নেই। জলবায়ু ও আবহাওয়া পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। ফলে এ সমস্ত প্রকৃতিনির্ভর দরিদ্র জনগণ বঞ্চিত ও অবহেলিত হচ্ছে। তাদের কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে। সবার জন্য সুষম ও পর্যাপ্ত খাদ্যের নিশ্চয়তা দিতে হবে। বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ করে পতিত জমি চাষাবাদ করে আবাদি জমির উপর আবাসন তৈরি না করে তা সংরক্ষণ করা, দেশীয় গাছ রোপণ, বন ও পাহাড় পর্বত সংরক্ষণ, মৎস্য চাষ ও পশুপালন করে প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫। জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্ব উষ্ণায়ন, পরিবেশ রক্ষা, ন্যায্যতা ও নৈতিকতা বিষয়ে সকল স্তরের মানুষের মাঝে জাগরণ ঘটাতে হবে। এর জন্য সচেতনতামূলক শিক্ষা সেমিনারের আয়োজন করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক ব্যতীতও বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। গণমাধ্যম ব্যবহার করে মানুষের মাঝে গণচেতনা জাগাতে হবে। প্রাণের অধিকার, শিশুর যত্ন ও শিক্ষা, প্রকৃতির যত্ন, পানির অপচয় রোধ, নদী খনন, বর্জ্য নিঃসরণ আইন, সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে শিক্ষা জোরালো করতে হবে। পরিবেশ দূষণ রোধ করার উপায় জানতে হবে এবং সবাইকে সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে।

কাজ ১ : পরিবেশ সংরক্ষণে তুমি তোমার এলাকায় কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পার তা লেখো।

কাজ ২ : পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে মানুষকে কীভাবে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া যায় তা দুজন দুজন আলোচনা করো এবং পরে কয়েকজন মিলে উপস্থাপন করো।

পাঠ ৪ : সৃষ্টিকে ভালোবাসার মাধ্যমে ঈশ্বরকে ভালোবাসা

আমরা পূর্বেই জেনেছি সৃষ্টি মুক্তি স্বয়ং ঈশ্বরের। "আদিতে পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।" (আদি ১:১)। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা।

গাছ লাগানো সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসার চিহ্ন

শেষে "পরমেশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন; পরমেশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে তাঁকে সৃষ্টি করলেন: পুরুষ ও নারী করে তাদের সৃষ্টি করলেন।" তিনি দেখলেন, সমস্ত সৃষ্টিই অতি উত্তম। মানুষ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজেকেই প্রকাশ করেছেন। তিনি মানুষের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন। সুতরাং মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও ভালোবাসতে পারে।

সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর ভালোবাসাকেই মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন। কারণ তিনি ভালোবাসার উৎস। তিনিই প্রকৃত ভালোবাসা। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে ভালোবাসতে হয়। ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ভালোবাসা ও সৃষ্টির যত্ন নেওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারব।

সৃষ্টির যত্ন নেওয়া ও তার উপর প্রভুত্ব করতে গিয়ে মানুষকে অবশ্যই সর্বপ্রথম তার নিজের উত্তমতা ও সৌন্দর্যকে রক্ষা করতে হবে। সৃষ্টির যত্ন করার দায়িত্ব একটি ভালোবাসার দায়িত্ব, এটি দাসত্ব নয়। মানুষ সৃষ্টির যত্ন নিবে; সৃষ্টিও মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। সৃষ্টির সেবা পাওয়ার কারণেও মানুষকে সৃষ্ট সমস্ত কিছুর প্রতি ভালোবাসা ও তার যত্ন করা প্রয়োজন।

মোশীর কাছে ঈশ্বর জ্বলন্ত ঝোপের মধ্য থেকে যেমন বলেছিলেন, "তোমার পায়ের জুতা খুলে ফেল, কেননা যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ তা পবিত্র ভূমি" (যাত্রা ৩:৫)। সমগ্র সৃষ্টির ব্যাপারেই ঈশ্বরের এই কথা খাটে। সেই মন নিয়েই ঈশ্বরের সৃষ্টির মাঝে বিচরণ করা প্রয়োজন। সৃষ্টিকে যত্ন নেওয়া ও মানুষকে ভালোবাসা প্রয়োজন। সৃষ্টিকে যত্ন করার ও মানুষকে সেবা করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে সেবা করা ও ভালোবাসা প্রকাশ পাবে। সৃষ্টির উত্তমতাও রক্ষা পাবে।

কাজ : "সৃষ্টির যত্নে নয়, উপাসনার মাধ্যমেই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়"–এই বিষয়ের উপর একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করো।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো

১. ভালোবেসে ঈশ্বর ... নেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন মানুষকে।

২. ঈশ্বর ... বিশ্রাম নিয়েছেন।

৩. ব্যক্তিস্বার্থে ... নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

৪. ... ভালোবাসার উৎস।

৫. আদিতে ... আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির কাজ শুরু করলেন।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর	• আমাদের প্রত্যেকের পবিত্র কর্তব্য
২. ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টিকে লালন করা	• পূর্ণতা দিয়েছেন
৩. তাঁর সমকক্ষ আর	• বাংলাদেশে দরিদ্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে
৪. নিজের স্বার্থে সৃষ্টির	• কেউ নেই
৫. প্রাকৃতিক বৈরিতা ও দুর্যোগের ফলে	• অপব্যবহার করছি
	• হারিয়ে যাচ্ছে

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পরিবেশ দূষিত হওয়ার জন্য প্রধানত দায়ী কারা?

ক. প্রকৃতি
খ. মানুষ
গ. ব্যবসায়ী
ঘ. ধনী দেশগুলো

২. কেন ঈশ্বর মানুষকে সর্বশেষে সৃষ্টি করেছেন?

ক. মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে
খ. যেন সুন্দর পৃথিবী পায়
গ. মানুষের ভালোবাসার জন্য
ঘ. ঈশ্বরের গৌরবের জন্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রীমা ফুলের বাগান করতে ও হাঁস-মুরগি পালন করতে পছন্দ করে। তাই সে প্রতিদিন ফুলের বাগানে পানি দেয়, আগাছা পরিষ্কার করে এবং হাঁস-মুরগিকে বারবার খাবার দেয়। রীমা ফুল ও হাঁস-মুরগি বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে।

৩. রীমার কাজের মাধ্যমে কী প্রকাশ পেয়েছে?

ক. সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা
খ. সৃষ্টির উপর প্রভুত্ব
গ. সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব
ঘ. নিজের আধিপত্য বিস্তার

৪. উদ্দীপকে প্রকাশ পায়–

i. সৃষ্টির উত্তমতা
ii. ঈশ্বরের ভালোবাসা
iii. সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. i ও ii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অর্ণব খাল ভরাট করে তার বসতবাড়ি তৈরি করেছে। গাছ কেটে ঘরের অনেক আসবাবপত্র তৈরি করে ঘরকে সুন্দর করে সাজিয়েছে। কিন্তু বাড়ির চারপাশে সে বিভিন্ন প্লাস্টিক, পলিথিন ও রান্নাঘরের যাবতীয় ময়লা ফেলে রেখেছে। সে পাখির মাংস খেতে পছন্দ করে, তাই সে প্রায়ই পাখি শিকার করে। মাঝে মধ্যে সে পশুও শিকার করে, গাছ ও চামড়া বিক্রি করে অর্থও উপার্জন করে

ক. সকল সৃষ্টির যত্ন নেওয়া কার দায়িত্ব?

খ. সৃষ্টির সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো।

গ. অর্ণবের কাজের মাধ্যমে পরিবেশে কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়—ব্যাখ্যা করো।

ঘ. অর্ণব তার বদঅভ্যাস পরিবর্তন করার জন্য কী কী উপায় অবলম্বন করতে পারে বলে তুমি মনে করো—পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তোমার মন্তব্য লেখো।

২. জন ও জেনি গাজীপুরের 'প্রার্থনা কুঞ্জে' একটা সেমিনারে গেল। সেখানে গিয়ে সেখানকার পরিবেশ দেখে তারা অবাক হয়ে বলল, 'বাহ্ কী সুন্দর পরিবেশ।' প্রার্থনা কুঞ্জের চারদিকে বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছ সারিবদ্ধভাবে রয়েছে। রয়েছে ফুলের বাগানও। পুরোহিত বললেন, 'এ সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি।' বাড়ি ফিরে যাবার পর তারা একটা 'সংঘ' গঠন করল। সংঘের মাধ্যমে দরিদ্রদের সাহায্য, অসুস্থদের সেবা, বয়স্ক শিক্ষা, ফুল ও ফলের গাছ লাগানো ইত্যাদি কার্যক্রম শুরু করে। তাদের উদ্যোগে গ্রামে গাছ কাটা, পাখি শিকার করা ইত্যাদি কাজ বন্ধ হলো। গ্রামের সকলেই তাদের এ কাজে খুব খুশি।

ক. প্রকৃত ভালোবাসার উৎস কে?

খ. কীভাবে সৃষ্টির উত্তমতা হারিয়ে যাচ্ছে?

গ. ঈশ্বরের দেওয়া দায়িত্ব জন ও জেনি কিভাবে পালন করে—ব্যাখ্যা করো।

ঘ. জন ও জেনি কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরকে ভালোবাসে ও সম্মান দেখায়—উক্তিটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করো।

২০২৫

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মানুষ কেন সৃষ্টির যত্ন নেবে?

২. সৃষ্টির সৌন্দর্য কীভাবে কলুষিত হচ্ছে?

৩. আমরা কীভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারি?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. কী উপায়ে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মকে লালন পালন ও সংরক্ষণ করা যায়?

২. সৃষ্টিকে ভালোবাসা ও তার যত্ন করার মাধ্যমে কীভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসা ও সম্মান করা যায়– ব্যাখ্যা করো।

৩. ঈশ্বরের সৃষ্টিকে কীভাবে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা যায়? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

২০২৫

তৃতীয় অধ্যায়

ঈশ্বর ও মানুষ

আদিপুস্তকে বর্ণিত সৃষ্টি কাহিনিতে আমরা দেখতে পাই ঈশ্বর একের পর এক সবকিছু সৃষ্টি করলেন। প্রতিদিনই তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি তাকিয়ে দেখলেন তা উত্তম হয়েছে। ষষ্ঠ দিনে তিনি বললেন, "এবার মানুষকে গড়ে তোলা যাক আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদেরই সাদৃশ্যে।" তিনি তাই করলেন। এভাবে ঈশ্বরের আপন প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্ট হলো। সকল কিছুর উপর প্রভুত্ব করার দায়িত্ব তিনি মানুষকে দিলেন।

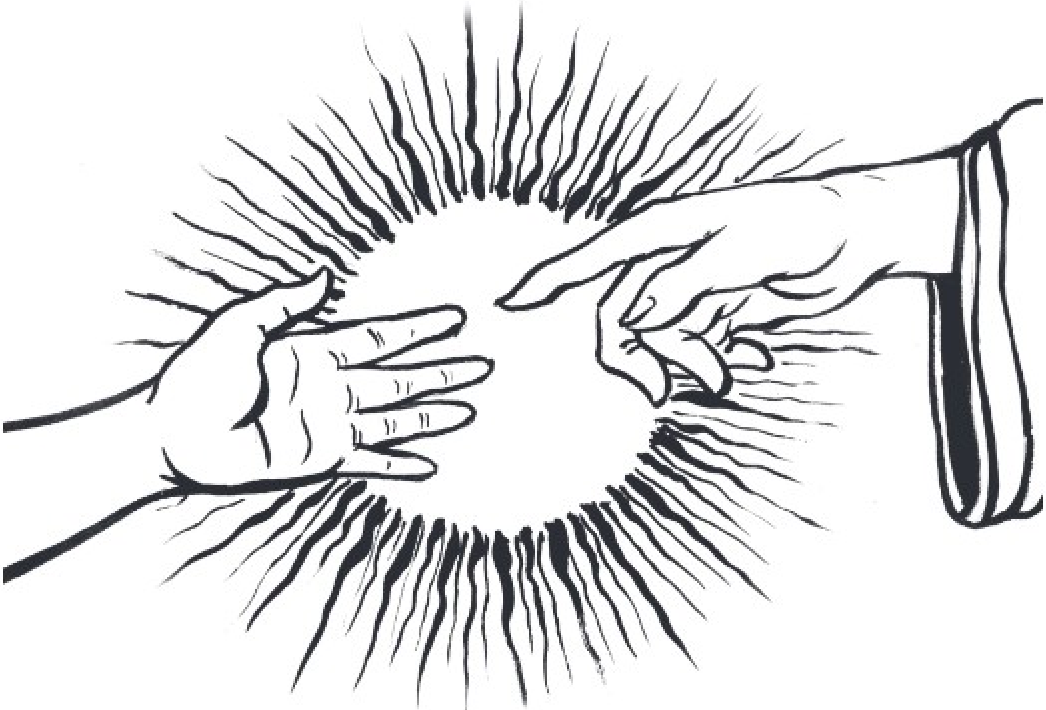

ঈশ্বর ও মানুষের মিলন

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- মানুষ ঈশ্বরের সেবাকর্মী-এই ধারণাটি বিশ্লেষণ করতে পারব;
- ঈশ্বরের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে মানুষের সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা ও সম্পর্কের ফল বর্ণনা করতে পারব;
- ঈশ্বরের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে মানুষের সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখব।

পাঠ ১ : ঈশ্বরের সৃষ্টির সেবাকর্মী মানুষ

মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও ভালোবাসার প্রকাশ। মানুষ সৃষ্টির পিছনে ঈশ্বরের একটি মহৎ পরিকল্পনা ছিল। মানুষের সাথে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছেন নিবিড় সম্পর্ক। তার মধ্যে তিনি দেখতে চেয়েছেন তাঁর আত্মপ্রকাশ। মানুষকে তিনি দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্ব এবং সৃষ্টির উপর প্রভুত্ব করার ক্ষমতা। মানুষ সৃষ্টির পর ঈশ্বর মানুষকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, "ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি করো! তোমরা পৃথিবীকে ভরিয়ে তোলো, তাকে বশীভূত করো। সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি এবং পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করে যত প্রাণী, তাদের সকলের উপর তোমরা প্রভুত্ব করো" (আদিঃ ১:২৮)। এই আশিস-বাণীর মধ্যেই মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। আমরা আগে জেনেছি যে, ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরব কীর্তন করার জন্য তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু শুধু তাই নয়। তিনি মানুষের উপর দিয়েছেন সৃষ্টির সমস্ত দায়িত্বভার। মানুষ ঈশ্বরের সেবাকর্মী। আমরা এবার জানব মানুষ কেন ও কীভাবে ঈশ্বরের সেবাকর্মী হতে পারে? অর্থাৎ সেবাকর্মী হওয়ার অর্থ কী?

১। ঈশ্বরের সেবাকর্মী হওয়া মানুষের জন্য একটি আহ্বান। এই সেবা কর্মের মধ্য দিয়েই তার নিজের মর্যাদা প্রকাশিত ও বিকশিত হয়। যুগে যুগে তাই মানুষকে তিনি ডাকেন। তাই আমরা বলতে পারি সেবাকর্মী হয়ে ওঠার অর্থ হলো ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকা, তাঁর আহ্বানে সাড়া দেওয়া। বালক সামুয়েলকে ঈশ্বর যখন ডেকেছিলেন তখন এলি তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, এভাবে উত্তর দিতে : "বলুনপ্রভু আপনার দাস শুনছে।" যুগে যুগে ঈশ্বরের কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি বিভিন্ন মানুষকে বা প্রবক্তাদের ডেকেছেন, যাঁরা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন, তারা ঈশ্বরের পক্ষে কথা বলেছেন। আজও তিনি আমাদের এভাবে ডাকেন তাঁর কাজের জন্য।

২। সেবাকর্মী হওয়ার অর্থ ঈশ্বরের নামে যত্ন নেওয়া বা পরিচালনা করা। ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন নিজের প্রতিমূর্তিতে। মানুষকে তিনি দিয়েছেন অসাধারণ গুণ, বুদ্ধি ও ক্ষমতা। ঈশ্বরের দেওয়া এই সকল গুণ ও বুদ্ধি ব্যবহার করে মানুষ তার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করছে।

৩। ঈশ্বর ভালোবেসে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং ভালোবাসার ক্ষমতা ও আদেশ দিয়েছেন। মানুষের মধ্য দিয়ে, মানুষের পারস্পরিক সেবা ও ভালোবাসার মধ্যে ঈশ্বর নিজেকে ও তাঁর ভালোবাসাকে প্রকাশ করতে চান। তাই আমরা বলতে পারি নিজের কিছু কিছু গুণ ঈশ্বর মানুষের মধ্যে দিয়েছেন। মানুষ ঈশ্বর প্রদত্ত সেই গুণ ব্যবহার করে ঈশ্বরের ও সৃষ্টির সেবা করে।

৪। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি জীবনদাতা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। তিনি মানুষকে সুযোগ দেন তাঁর সৃষ্টির যত্ন নেওয়া ও প্রতিপালনের কাজে অংশগ্রহণ করার। উদাহরণস্বরূপ ডাক্তারগণ মানুষের নানারকম জটিল রোগের চিকিৎসা করে থাকেন। ঈশ্বর হলেন আসল নিরাময়কারী-ডাক্তার উপলক্ষ্য। ঈশ্বরের দেওয়া বুদ্ধি ও শক্তি বলেই ডাক্তার তার দায়িত্ব

২০২৫

পালন করেন। পিতামাতার মধ্য দিয়ে তিনি পৃথিবীতে নতুন জীবন দান করেন। এভাবে তাঁরা হয়ে উঠছেন ঈশ্বরের সেবাকর্মী।

৫। যীশু নিজেই বলেছেন আমি তোমাদের আর দাস বলছি না বরং বন্ধু বলছি। বন্ধুর জন্য প্রাণ দেবার চেয়ে বড় ভালোবাসা আর নাই। এর থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি আমরা ঈশ্বরের বন্ধু হতে আহূত। আর বন্ধু হিসাবেই তিনি সবকিছু আমাদের সাথে সহভাগিতা করেন। পুরাতন নিয়মে আব্রাহামকে বলা হয় "ঈশ্বরের বন্ধু"।

৬। আপন প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করে তিনি মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় দান অর্থাৎ স্বাধীনতা দিয়েছেন। মানুষ তার স্বাধীনতা ব্যবহার করে ঈশ্বরের কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে। নিজের জীবন দিয়ে স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনের মাধ্যমেই মানুষ সবচেয়ে বড় সেবাকর্মী হয়ে উঠে।

কাজ : তুমি কীভাবে নিজেকে ঈশ্বরের সেবাকর্মী হিসেবে দেখো, তার তিনটি দিক দলে সহভাগিতা করো।

পাঠ ২ : এদেন উদ্যানে ঈশ্বর ও মানুষের সুসম্পর্ক

ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। সে সময় পৃথিবীর জমিতে কোনো গাছপালা বা ঝোপঝাড় কিছুই ছিল না। তখন ঈশ্বর পৃথিবীর উপর বৃষ্টি নামিয়ে আনলেন। মাটি ভিজিয়ে রাখার জন্য একটি জলধারা নামিয়ে আনলেন। কিন্তু জমিতে চাষাবাদ করার জন্য কোনো মানুষ তখনো ছিল না। ঈশ্বর মাটি থেকে একমুঠো ধুলো তুলে নিলেন। তা থেকে তিনি গড়ে তুললেন একজন মানুষ। তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার মধ্যে প্রাণবায়ু অর্থাৎ নিঃশ্বাস প্রবেশ করিয়ে দিলেন। তখন মানুষ হয়ে উঠল এক সজীব প্রাণী। তিনি তার নাম রাখলেন আদম অর্থাৎ মানুষ।

মানুষকে সৃষ্টি করে ঈশ্বর তাঁদের পরম সুন্দর ও সুখের স্থানে রাখলেন। এই জায়গাটির নাম হলো এদেন বাগান। মানুষের আনন্দ ও সুখের জন্য তিনি সব কিছু তৈরি করলেন। তাঁর সমস্ত কিছু ভোগ করার অধিকারও দিলেন। এখানকার সব গাছপালা খুবই চমৎকার। ফলগুলোও ছিল খুব সুমিষ্ট। বাগানের মাঝখানে তখন বেড়ে উঠল ভালোমন্দ জ্ঞানের বৃক্ষ।

মানুষকে ঈশ্বর এই বাগানের অধিকারী করে তুললেন। তিনি চাইলেন মানুষ যেন এদেন বাগানের দেখাশুনা করে। তিনি তাঁকে ভালোমন্দ জ্ঞানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল খেতে বারণ করেছিলেন। তারপর একসময় ঈশ্বর দেখলেন আদম বড় একাকী। ঈশ্বর বললেন : "মানুষের একা থাকা ভালো নয়। তাই আমি এখন তার জন্য এমনই একজনকে গড়ে তুলব, যে তাকে সাহায্য করবে, তার

যোগ্য সঙ্গী হবে।" তারপর প্রভু ঈশ্বর মানুষের উপর নামিয়ে আনলেন এক তন্দ্রার আবেশ। একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ল। তার বুক থেকে একটি পাঁজর খুলে নিয়ে তিনি গড়ে তুললেন একজন নারীকে। সে হয়ে উঠল মানুষের যোগ্য সঙ্গী। মানুষ অর্থাৎ আদম বুঝতে পারলেন যে তাঁর সঙ্গে হবার দেহমনের আত্মীয়তা রয়েছে। তারা দুইজনেই সমানভাবে মানবসত্তার অধিকারী। তারা দুইজনেই বুঝতে পারলেন যে তাঁরা সমানভাবে একে অন্যের পরিপূরক কিন্তু একইভাবে নয়। আর তাই তারা মিলিত জীবনের দিকে প্রবল আকর্ষণ বোধ করেন। কী অপার সুখে ঈশ্বরের নিবিড় সান্নিধ্যে ও পরস্পরের প্রতি মিলনের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ স্বর্গে বাস করছিল। তাঁরা উলঙ্গ ছিলেন কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল না কোনো লজ্জাবোধ। পরস্পরের সাথে এরূপ সম্পর্কের মধ্য দিয়েই মানুষ ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল।

কাজ : এদেন বাগানে ঈশ্বরের সাথে আদম ও হবার সম্পর্ক নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

পাঠ ৩ : অবাধ্যতার পাপ

এদেন বাগানে মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে মহাসুখে বাস করছিল। ঈশ্বরের সাথে মানুষের এই সুসম্পর্ক শয়তান কোনোভাবেই সহ্য করতে পারছিল না। এই সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য শয়তান সুযোগ খুঁজতে লাগল। স্থলভূমিতে সবচেয়ে চালাক প্রাণী হলো সাপ। শয়তান একদিন সাপের বেশে এসে নারীকে বলল,"ঈশ্বর কি সত্যিই এই কথা বলেছেন : এই বাগানের কোনো গাছের ফল তুমি খাবে না?" নারী সাপকে উত্তর দিলো: আমরা এই বাগানের যে কোনো গাছের ফল খেতে পারি; শুধুমাত্র যে গাছটি বাগানের মাঝখানে রয়েছে, সেটির সম্পর্কে ঈশ্বর বলেছেন, "তোমরা তা খাবেও না ছোঁবেও না! যদি তা খাও তাহলে তোমরা মরবেই মরবে।"

তখন সাপ নারীকে বলল : কক্ষনো না, তোমরা মরবেই না। ঈশ্বর তো ভালোভাবেই জানেন, যেদিন তোমরা ওই ফল খাবে, সেদিন তোমাদের চোখ যেন খুলেই যাবে, তোমরা দেবতার মতোই হয়ে উঠবে। ভালোমন্দ জানতেই পারবে তোমরা! তখন নারী দেখলেন, ওই গাছের ফল খাদ্য হিসেবে ভালোই আর তা দেখতেও ভারি সুন্দর। তাছাড়া বোধবুদ্ধি পাবার ব্যাপারে তার তো একটা আকর্ষণও রয়েছে। তাই তিনি গাছ থেকে ফল পেড়ে নিজে খেলেন ও তার স্বামীকেও দিলেন। তখন তাদের দুইজনেরই চোখ খুলে গেল। তারা বুঝতে পারলেন তাঁরা উলঙ্গ। আঞ্জীর গাছের পাতা একসঙ্গে জুড়ে নিয়ে তারা নিজেদের জন্য আবরণ তৈরি করলেন। বুঝতে পারলেন, তারা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছেন এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছেন।

ঈশ্বরের পায়ের শব্দ শুনে তারা ভয় পেলেন। তারা ঈশ্বরকে দেখে লুকিয়ে পড়লেন। তাদের মনের নির্মল নিষ্পাপ পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গেল। এতদিন ঈশ্বরের সাথে তাঁদের অতি সহজ, স্বাভাবিক ও সুখময় সম্পর্ক ছিল। এখন কিন্তু তারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য আর সহ্য করতেই পারছিলেন না। ঈশ্বরকে তারা ভয় পেতে শুরু করলেন। তাঁদের মধ্যে তীব্র অপরাধ বোধ শুরু হলো ও মানুষের পতন হলো। ঈশ্বরের সাথে

মানুষের সুসম্পর্ক নষ্ট হলো। আদম তাঁর পাপের জন্য হবাকে দোষারোপ করলেন আর হবা দোষারোপ করলেন সাপকে। ঈশ্বর সাপকে ও নরনারীকে শাস্তি দিলেন। মানুষ স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীতে এলো। স্বর্গসুখ ও স্বর্গের দরজা মানুষের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

কাজ : আদি পুস্তক ৩ অধ্যায় পাঠ করে মানুষের পতনের কাহিনীটি অভিনয় করে দেখাও।

পাঠ ৪ : সম্পর্ক পুনঃস্থাপন

ঈশ্বর মানুষকে এত ভালোবাসলেও মানুষ বারংবার তাঁর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষ পাপের জীবনযাপন করতে লাগল। কিন্তু তিনি মানুষকে রক্ষা করতে চান। মানুষের পাপের কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করার জন্য তিনি বারংবার উদ্যোগ নিলেন। মানব ইতিহাসে তিনি প্রবেশ করলেন। পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বর যে উদ্যোগ নিয়েছেন এবার আমরা সে বিষয়গুলো জানব।

আমরা আগেই জেনেছি যে, মানুষ অবাধ্য হয়ে পাপ করলেও ঈশ্বর মানুষকে একেবারে ত্যাগ করেননি। তাকে তিনি পাপ থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি তাঁর পুত্রকে পাঠাবার কথা বললেন। তাঁর পুত্রকে মানুষ করে পৃথিবীতে পাঠাবার জন্য তিনি একটি জাতিকে মনোনীত করলেন। ঈশ্বরের মনোনীত জাতি হলো ইস্রায়েল জাতি। ইস্রায়েল জাতির বিভিন্ন ব্যক্তি, রাজা ও প্রবক্তাকে তিনি বেছে নিলেন তাঁর প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনা পূর্ণ করার জন্য।

আব্রাহামকে তিনি করলেন মনোনীত জাতির পিতা, বিশ্বাসীদের পিতা। তিনি তাঁর সঙ্গে একটি সন্ধি স্থাপন করলেন। তিনি বললেন, "আমি এখন আমার ও তোমার মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপন করছি; তোমার বংশধরদের সংখ্যা আমি সুবিপুল করে তুলব।"

পৃথিবী যখন পাপে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তখন তিনি জলপ্লাবন দিয়ে পৃথিবী ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু তিনি নোয়ার মধ্য দিয়ে মানবজাতির সঙ্গে একটি সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। তখন তিনি আকাশে একটি রঙধনু স্থাপন করেছিলেন এই সন্ধির প্রতীক হিসেবে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, মানুষকে তিনি আর এভাবে ধ্বংস করবেন না।

মোশীকে ঈশ্বর আহ্বান করেছিলেন মিশর দেশের দাসত্ব থেকে ইস্রায়েল জাতিকে মুক্ত করার জন্য। মোশীর নেতৃত্বে ইস্রায়েল জাতি প্রতিশ্রুত দেশের দিকে যাত্রা আরম্ভ করেছিল। মিশর দেশ থেকে কানান দেশে যাত্রাকালে ইস্রায়েল জাতি বিভিন্নভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করেছে। ইস্রায়েল জাতিকে ঈশ্বর বার বার বলেছেন, তোমরা আমার আপন জাতি আর আমি তোমাদের আপন ঈশ্বর।

তারপর তিনি রাজা ও প্রবক্তাদের বেছে নিলেন। রাজা দাউদকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। পরে এই বংশে তাঁর পুত্র জন্ম নিয়েছিলেন। প্রবক্তা ইসাইয়া মুক্তিদাতার আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

২০২৫

করেছেন। সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের চূড়ান্ত পর্যায় হলো ঈশ্বরপুত্র যীশু খ্রীষ্টের মানব হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ। রাজা দাউদের বংশধর হয়ে একজন নারীর গর্ভে যীশু মানুষরূপে জন্ম নিলেন। মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করতে তিনি ক্রুশ মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন। তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন। মৃত্যুকে জয় করে তিনি শয়তানের কবল থেকে মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করলেন। মানুষকে তার হারানো মর্যাদা ফিরিয়ে দিলেন। তিনিই মশীহ্। তিনি হলেন প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা। তাঁর মধ্য দিয়েই পূর্ণ হলো ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনা। ঈশ্বর ও মানুষের নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক আবার স্থাপিত হলো। যীশু হলেন নতুন আদম। এই সুসম্পর্ক রক্ষার্থে যীশু স্থাপন করলেন মণ্ডলী ও পুণ্য সংস্কারসমূহ। দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা আদিপাপের ক্ষমা লাভ করি এবং মণ্ডলীতে প্রবেশ করে ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠি। পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করে আমরা পাপের ক্ষমা লাভ করি এবং ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাবার যোগ্য হয়ে উঠি।

ইতিহাসের প্রভু এইভাবে অসীম ক্ষমা ও ভালোবাসায় মানুষকে রক্ষা করলেন। মানুষের অবিশ্বস্ততা সত্ত্বেও তিনি নিজ উদ্যোগে মানুষের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করেন।

পাঠ ৫ : ঈশ্বরের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে মানুষের সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপায়

আমরা সবাই শান্তি চাই, সর্বদা আনন্দে থাকতে চাই। আমরা সঙ্গী চাই, বন্ধু চাই। ঈশ্বর মানুষের মধ্যে এরকমই একটি সহজাত প্রবণতা দিয়েছেন। আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে কারো না কারো সাথে সম্পর্কিত হতে চাই। এমনকি একটি ছোট্ট শিশুও তার মতো আর একজন শিশুকে পেলে খুব খুশি হয়। কেউ আমাদের ভালোবাসলে বা আমরা কাউকে ভালোবাসতে পারলে খুব আনন্দ পাই। ঈশ্বরও আমাদের সাথে সম্পর্ক গড়ার জন্যে প্রথমে উদ্যোগ নিয়েছেন। ঈশ্বরপুত্র যীশু আমাদের সাথে এক হবার জন্যে মানুষরূপে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। কীভাবে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যায় এবার আমরা সে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।

১। **যোগাযোগ :** সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হলে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। যোগাযোগ নানাভাবে হতে পারে। সরাসরি দেখা-সাক্ষাৎ করে, কথা বলে, নানা রকম মাধ্যম ব্যবহার করে– যেমন, চিঠিপত্র, ইমেইল ও ফোন করার মাধ্যমে আমরা যোগাযোগ রক্ষা করে মানুষের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে পারি।

২। **মানবসেবা :** মানুষ ও ঈশ্বরের সাথে আমরা সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক রচনা করতে পারি মানুষের সেবা করে বা মানুষের জন্য কল্যাণকর কিছু করার মাধ্যমে। কারণ যে মানুষকে আমরা চোখে দেখতে পাই তাকে ভালো না বেসে আমরা কখনোই অদৃশ্য ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারি না।

৩। **উপাসনা :** নিয়মিত ধ্যান, প্রার্থনা, উপাসনায় অংশগ্রহণ, বাইবেল পাঠ এবং সবকিছুতে ঈশ্বরের মঙ্গলময় উপস্থিতি অনুভব করে আমরা ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারি। ঈশ্বরের সাথে

২০২৩

আমাদের সুসম্পর্ক থাকলে মানুষের সাথেও আমাদের সম্পর্ক ভালো হবে। আবার মানুষের সাথে সুসম্পর্ক থাকলে ঈশ্বরের সাথেও সম্পর্ক ভালো থাকবে।

৪। **আস্থা ও বিশ্বাস :** পারস্পরিক আস্থা সুসম্পর্ক রক্ষার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা যখন কারো উপর আস্থা স্থাপন করি এবং কেউ যখন আমাদের উপর আস্থা রাখে তখন খুব সহজেই আমাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। ঈশ্বরের উপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখে তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক নিবিড় হয়।

৫। **সততা :** সুসম্পর্কের ভিত্তি হলো সততা। সম্পর্কের আদান প্রদান ও ভাব বিনিময়ে আমরা যখন সৎ থাকি তখন সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। ছলচাতুরী বা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কখনো সুসম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না।

৬। **আপন করে নেওয়া :** আমরা দোষগুণ মিলিয়ে মানুষ। আমরা যখন কাউকে আপন করে নিই এবং কেউ যখন আমাদের আপন করে গ্রহণ করে তখন আমরা খুব আনন্দ পাই। পরস্পরকে গ্রহণীয়তার মধ্য দিয়ে আমরা একে অন্যের আপনজন হয়ে উঠি। মানুষ মনে প্রাণে পরস্পরের আপন হতে চায়। ঈশ্বর সব অবস্থায় আমাদের গ্রহণ করেন বলেই আমরা তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারি।

৭। **শ্রদ্ধা :** পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের মধ্য দিয়ে আমরা সুসম্পর্ক গড়ে তুলি। মতামত প্রকাশের সুযোগ দান, কথায় গুরুত্ব দেওয়া এবং বিভিন্ন অবস্থার সময় পক্ষাবলম্বন করে আমরা একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে পারি। প্রত্যেক মানুষ ভিন্ন বা আলাদা, একক ও অনন্য। মানুষের এ ভিন্নতার প্রতিও শ্রদ্ধাবোধ সম্পর্ক গঠনে বিশেষ সহায়ক। ঈশ্বর আমাদের সবার স্বাধীন ইচ্ছাকে মর্যাদা দেন।

৮। **সমঝোতা :** পরস্পরকে বোঝার মাধ্যমে একে অপরকে গ্রহণ করা, কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমরা সমঝোতায় আসতে পারি। এতে করে সুসম্পর্ক বজায় থাকে। ঈশ্বর আমাদের সব অবস্থা বোঝেন।

৯। **সাহায্য-সহযোগিতা:** জীবনের বিশেষ অবস্থা ও সময়ে বিশেষ করে দুর্দিনে বা বিপদের সময় সাহায্য সহযোগিতা করলে ও পেলে আমরা শক্তি ও সাহস পাই। আনন্দ ও উৎসবের দিনেও আমরা উপস্থিত হয়ে নিজেরা খুশি হই এবং অন্যদেরও খুশি করি। এতে করেও আমাদের সম্পর্কের অনেক উন্নতি হয়। ঈশ্বর সব অবস্থায় আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করেন বলেই আমরা তাঁর সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

১০। **সাম্য বা সমান মর্যাদা :** ছোট-বড়, নারী-পুরুষ ও ধনী-গরিব ভেদাভেদ না করে সবাইকে সমান মর্যাদা দান করলেও সম্পর্ক গভীর হয়। ঈশ্বরের চোখে আমরা সবাই সমান।

এভাবে মানুষ মানুষকে ভালোবেসে ও সম্পর্ক রক্ষা করে ঈশ্বরের সাথেও সুসম্পর্ক স্থাপন ও তা বজায় রাখতে পারে।

২০২৫

কাজ : তোমাদের শ্রেণিকক্ষে কীভাবে বা কী কী উপায়ে তোমরা সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পার তা আলোচনা করে একটি পোস্টার তৈরি করো ও সেটি শ্রেণিকক্ষে ঝুলিয়ে রাখো।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো

১. দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা ... পাপের ক্ষমা লাভ করি।

২. সকল কিছুর উপর ... করার দায়িত্ব ঈশ্বর মানুষকে দিলেন।

৩. ঈশ্বরের নিবিড় সান্নিধ্য ও পরস্পরের প্রতি মিলনের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ ... বাস করছিল।

৪. মানুষ স্বর্গ থেকে ... হয়ে পৃথিবীতে এলো।

৫. সুসম্পর্কের ভিত্তি হলো ...।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো

বাম পাশ	ডান পাশ
১. মানুষের সাথে ঈশ্বর গড়ে তুলতে চেয়েছেন	• নিবিড় সম্পর্ক
২. মানুষ সৃষ্টির পিছনে ঈশ্বরের	• একটি মহৎ পরিকল্পনা ছিল
৩. ঈশ্বর মানুষের উপর দিয়েছেন	• পৃথিবীতে এলো
৪. ডাক্তারের সাহায্যে ঈশ্বর	• নিরাময় কাজ করছেন
৫. মানুষ স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে	• কর্তৃত্ব করার অধিকার

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পুরাতন নিয়মে কাকে 'ঈশ্বরের বন্ধু' বলা হয়েছে?

ক. মোশীকে খ. আব্রাহামকে

গ. দানিয়েলকে ঘ. এলিয়কে

২০২৫

২. মানুষকে ঈশ্বর এদেন বাগানের অধিকারী করে তুললেন কেন?

ক. কর্তৃত্ব করার জন্য
খ. পরিকল্পনা পূর্ণ করার জন্য
গ. মানুষের আনন্দ ও সুখের জন্য
ঘ. মানুষের পবিত্রতা রক্ষার্থে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

জয় বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। মা তাকে পড়তে বসতে বললে সে তা না করে সারাক্ষণ কম্পিউটারে গেম খেলে সময় নষ্ট করে। সন্ধ্যায় ঘরে প্রার্থনার সময় সে অনুপস্থিত থাকে। রবিবার দিন গির্জায় যায় না, নিজের ইচ্ছেমতো কাজকর্ম করে।

৩. মানুষের এরূপ অবস্থা থেকে ফেরানোর জন্য ঈশ্বর কাকে প্রেরণ করেছিলেন?

ক. মোশীকে
খ. এলিয়কে
গ. যীশুকে
ঘ. যোহনকে

৪. জয়ের এরূপ আচরণের ফল হতে পারে–

i. ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের অবনতি

ii. স্বর্গসুখ থেকে বিচ্যুত

iii. পরিবারে অশান্তি।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিখিল লোভী প্রকৃতির মানুষ। গ্রামের মানুষের জমিজমা দখল করে সে বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়েছে। গ্রামে সে বিশাল অট্টালিকা তৈরি করেছে এবং অনেক মূল্যবান আসবাবপত্র দিয়ে ঘর সাজিয়েছে। বিপুল সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বিপদে পড়ে কেউ তার কাছে সাহায্য চাইলে কখনো কাউকে সাহায্য করেনি। ধর্মপল্লির ফাদার তাকে এ পথ থেকে ফিরে আসার পরামর্শ দিলেন এবং বললেন, 'ঈশ্বর যুগে যুগে তোমার মতো মানুষকে ফেরানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।'

২০২৫

ক. সুসম্পর্কের ভিত্তি কী?

খ. সেবাকর্মী বলতে কী বুঝ?

গ. নিখিলের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক কী ধরনের? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. নিখিলের প্রতি যাজকের উক্তিটির যথার্থতা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করো।

২. মি. যেরম প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে দরিদ্র, দক্ষ, কর্মঠ কর্মচারী নিয়োগ করেন। সকল কর্মচারী প্রতিষ্ঠান প্রধানের দেওয়া দায়িত্ব ও কর্তব্য আগ্রহ ও দক্ষতার সাথে পালন করে। ফলে প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন উন্নতি করতে থাকে। এতে মি. যেরম খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধার দিকেও যথেষ্ট আগ্রহী হয়ে ওঠেন। আর্থিকভাবে দুর্বলদের আর্থিক সাহায্য দান করেন এবং বিভিন্নভাবে ঋণদানের ব্যবস্থা করে দেন।

ক. কার প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি হলো?

খ. ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক নষ্ট হলো কেন?

গ. মি. যেরমের কাজগুলো কীভাবে সেবাকর্ম তা আলোচনা করো।

ঘ. 'মি. যেরমের কাজ ছাড়াও আরও বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব'– উক্তিটির যথার্থতা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করো।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ঈশ্বর কেন আপন প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করলেন?

২. সেবাকর্মী বলতে কী বোঝায়?

৩. যীশু কেন মণ্ডলী ও পুণ্য সংস্কারসমূহ স্থাপন করলেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. মানুষ কীভাবে ঈশ্বরের সেবাকর্মী হতে পারে তা আলোচনা করো।

২. ঈশ্বরের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে মানুষের সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করো।

৩. এদেন বাগানে ঈশ্বরের সাথে আদম ও হবার সম্পর্ক নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

চতুর্থ অধ্যায়

মানুষের পতনের ফল

যে কোন মানুষের মধ্যে আমরা দুই দিকে অকর্ষণ দেখতে পাই : ভালোর জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং মন্দের দিকে আকর্ষণ। স্রষ্টা তো মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন এবং ভালোবাসার আদেশ দিয়েছেন। মানুষ যখন তার স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করে ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করে মন্দকে বেছে নেয়, তখন তার অমঙ্গলই হয়। সৃষ্টির আদিতে মানুষ স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করেছে বলে তার পতন ঘটল। এই অবাধ্যতার পাপই হচ্ছে মানুষের মৌলিক পাপ অর্থাৎ স্বেচ্ছায় মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিরোধিতা করা। আদম হবার পতনের কাহিনি আদি পুস্তকে নাটকীয়ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

মানুষের পতনের ফল, বিভিন্ন রকমের পাপ ও পাপের ফল সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই জ্ঞান লাভ করেছি। মানুষের অর্থাৎ আমাদের আদি পিতা-মাতার পাপের কথা জানার মধ্য দিয়ে আমরা আদিপাপের বিষয়েও জেনেছি। এই অধ্যায়ে আমরা মানুষের পতনের ফল নিয়ে একটু গভীর আলোচনা করব। আমরা জানি, মানুষ পাপ করে শাস্তি পেয়েছে বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করে ফেলেননি বা পরিত্যাগও করেননি। তাকে এখন থাকতে হচ্ছে কঠিন সংগ্রামের মধ্যে, কিন্তু ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য তার মধ্যে রয়েছে গভীর আকাঙ্ক্ষা। একদিকে পাপের প্রতি মানুষের একটা আকর্ষণ আছে, কিন্তু অন্যদিকে পাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার গভীর আগ্রহ এবং প্রচেষ্টাও কম শক্তিশালী নয়। এই অধ্যায়ের পাঠগুলো নিয়ে চিন্তা করার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের উপর আমাদের আস্থা আরও দৃঢ় করে তোলার চেষ্টা করব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- পতনের ফলে মানুষের কঠিন সংগ্রামপূর্ণ জীবনের বর্ণনা দিতে পারব;
- মানুষকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনার কথা বর্ণনা করতে পারব;
- মানুষের ঈশ্বর-অন্বেষণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় বর্ণনা করতে পারব;
- জীবনের সর্বাবস্থায় ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখব।

পাঠ ১ : পাপে পতন ও কঠিন সংগ্রাম

মানুষের পাপে পতন

নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানুষকে ঈশ্বর স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছিলেন। মানুষের সামনে রেখেছিলেন মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞানবৃক্ষের ফল। ঈশ্বর মানুষের উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, মানুষ স্বেচ্ছায় সেই পাপ থেকে বিরত থাকুক। কিন্তু মানুষ শয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে ঈশ্বরের অবাধ্য হলো। তার উপর ঈশ্বরের আস্থা মানুষ নষ্ট করে ফেলল। এভাবে মানুষ যে পাপ করল তাই মানুষের

মৌলিক পাপ। সেই পাপ দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের বদলে নিজের ইচ্ছাকেই বেছে নিল। ঈশ্বর মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তিতেই সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু মানুষ তা বুঝল না। শয়তানের প্রলোভনে পড়ে মানুষ অন্যভাবে 'ঈশ্বরের মতো' বা সমকক্ষ হতে চাইল। সে নিজেই ঈশ্বর হতে চাইল। তার এই অতি উচ্চ আকাঙ্ক্ষাই তার পতনের মূল কারণ হলো।

পাপের পরিণাম

পাপে পতিত হওয়ার ফলে আদম ও হবা তৎক্ষণাৎ আদি পবিত্রতার কৃপা হারিয়ে ফেলল। সাধু পল বলেন, "ইহুদি অনিহুদি, সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঐশ মহিমা থেকে বঞ্চিত।" (রোমীয় ৩:২৩)। পাপের ফলে আদি পিতামাতা ঈশ্বরকে ভয় পেতে শুরু করে।

পাপের পূর্বে মানুষের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তার দেহ, মন ও আত্মার সুসম্পর্ক ছিল। সুসম্পর্ক ছিল নারী ও পুরুষের মধ্যেও। কিন্তু পাপের ফলে এই সম্পর্ক নষ্ট হলো।

১। মানুষের দেহ ও মনের উপর আত্মার একটা প্রভাব ছিল। তার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রবল ছিল। কিন্তু এখন সেই আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হয়ে গেল। দেহ ও মন এখন আর আত্মার নির্দেশ সেভাবে মানছে না।

২। নারী-পুরুষের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা দেখা দিল। নারী ও পুরুষ সেই পাপময় অবস্থার কারণে পরস্পরকে কাম-লালসার দৃষ্টিতে দেখে এবং একে অপরের উপর কর্তৃত্ব করার প্রচেষ্টা চালায়।

৩। সৃষ্টির সাথেও তাদের ঐক্য নষ্ট হয়ে গেল। প্রকৃতি এখন তার সাথে আর বন্ধুসুলভ আচরণ করবে না। পৃথিবীর মাটি তার জন্য অভিশপ্ত হয়ে থাকছে। তাকে বহু কষ্ট করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, পৃথিবীর বুক থেকে খাবার জোগাড় করতে হয়। ওই মাটি খাদ্যের পাশাপাশি তার জন্যে এখন ফলায় যত রকমের আগাছা ও কাঁটাগাছ।

৪। মানুষকে যে ধুলা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল সেই ধুলাতেই তাকে আবার ফিরে যেতে হবে। অর্থাৎ মানব ইতিহাসে মৃত্যু প্রবেশ করল।

৫। আদি পাপের পর পৃথিবীর মানুষের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটল। তারা পরস্পরকে ঈর্ষা করতে শুরু করল। কাইন তার আপন ভাই আবেলকে হত্যা করল।

কঠিন সংগ্রামে পতিত মানুষ

মানুষ স্বাধীন হলেও আদি পিতামাতার পাপের কারণে তার উপর শয়তানের শক্তির প্রভাব সব সময় বিদ্যমান। আদি পাপের ফল হলো, "শয়তানের দাসত্ব যার ক্ষমতা রয়েছে মৃত্যুর উপর।" মানুষের

ভিতরে মন্দতার প্রতি একটা আসক্তি আছে; সে না চাইলেও তার ভিতর থেকে তা উৎসারিত হয়। মন্দতার প্রতি এই আসক্তির কারণে মানুষের মধ্যে বোধশক্তির অভাব দেখা দেয়। এই অভাবের কারণে নৈতিক ক্ষেত্রে মানুষ নানারকম মারাত্মক ভুল করে থাকে। এই ভুলের কারণে মানুষের জীবন ক্রমান্বয়ে হতে থাকে জটিল ও কষ্টকর, তার অশান্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিজের মধ্যে ও বাইরের জগতের সাথে তার সংগ্রামও এভাবে বেড়ে উঠতে থাকে।

মানুষের জীবনে পাপের প্রভাব এবং পাপের কারণে মানুষের জীবনে বিদ্যমান দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা টানাটানিটাই হলো তার কঠিন সংগ্রাম। এই সংগ্রাম হলো মন্দ বা পাপকে পরাজিত করে সত্য ও ভালোকে প্রতিষ্ঠা করার বিরামহীন প্রচেষ্টা। সব মানুষের মধ্যেই ভালো বা শুভশক্তি বিরাজমান। মানুষ ভালো ও সৎ থাকতে চায়। সত্য ও সুন্দরকে সব মানুষই ভালোবাসে। কিন্তু সত্য ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করা সব সময় সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না।

মানবজাতির গোটা ইতিহাসই মন্দ শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের কাহিনি। প্রভু যীশুর কথা অনুযায়ী তা ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকে জগতের শেষদিন পর্যন্ত স্থায়ী হবে। এই দ্বন্দ্বমুখর জগতে মানুষকে সংগ্রাম করেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে এবং ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করে মানুষ তার অন্তরে ও নিজ জীবনে পরিত্রাণ লাভ করতে সক্ষম হয়। মানুষের এই অসহায় অবস্থাকে সাধু পল এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : আমি যা করতে চাই, তা করি না বরং আমি যা করতে চাই না, তাই করি। তবে আমরা বিশ্বাস করি এই নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আমাদের মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে হবে। এই সংগ্রাম খ্রীষ্টবিশ্বাসীর বিশ্বাসের পরীক্ষা ও পরিত্রাণের সংগ্রাম। প্রতিদিনের জীবনযাপন ও প্রচেষ্টায় পাপ শক্তিকে পরাজিত করে শুভশক্তির জয়ের মাধ্যমেই আমরা পুনরুত্থিত খ্রীষ্টকে অভিজ্ঞতা করি। মৃত্যু বিজয়ের আনন্দ লাভ করি।

কাজ : প্রতিদিনের জীবনে শুভশক্তি ও পাপশক্তির দ্বন্দ্ব তুমি কীভাবে অভিজ্ঞতা কর তা অনুধ্যান করো ও দলে সহভাগিতা করো।

পাঠ ২ : পতিত মানবজাতিকে উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনা

ঈশ্বর অসীমরূপে মঙ্গলময় ও ভালোবাসাপূর্ণ। তাঁর সকল কাজ উত্তম। মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসাও সীমাহীন। পাপ করে মানবজাতি পতিত হলেও ঈশ্বর কিন্তু তাদের একেবারে বিনাশ করলেন না। তাদেরকে চিরতরে দূরেও ঠেলে দিলেন না। মানব ইতিহাসে পাপ বিদ্যমান। তা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। তাই মানুষকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর একটি মহান পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। পাপে পতিত হবার পর ঈশ্বর মানবজাতির কাছে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তিনি মানবজাতির পরিত্রাণ করবেন। পাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করবেন। পবিত্র বাইবেলের আদিপুস্তকের (আদি: ৩:৯,১৫) এই অংশকে বলা হয় 'প্রথম মঙ্গলসমাচার।' কারণ এখানে রয়েছে মশীহের বা ত্রাণকর্তার সম্বন্ধে প্রথম ঘোষণা, সর্প ও নারীর মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং নারীর বংশধরদের চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কিত ঘোষণা।

এই প্রতিশ্রুতিতে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা 'নতুন আদম' অর্থাৎ মুক্তিদাতা যীশুর আগমন সংবাদ জানতে পারি। যিনি ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য ছিলেন। প্রথম আদমের অবাধ্যতা ও পাপের ক্ষতিপূরণ তিনি পরিপূর্ণভাবেই করেছেন। যে নারীর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হলেন যীশুর মা মারীয়া, 'নতুন হবা'। যীশুর পুণ্য ফলে এবং ঈশ্বরের বিশেষ কৃপায় তিনি ছিলেন নিষ্কলঙ্কা বা পাপমুক্ত।

আমাদের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে ঈশ্বর কেন আদি মানবকে পাপ করা থেকে রক্ষা করেন নি? মহাপ্রাণ সাধু লিও বলেছেন, "আমাদের জন্য খ্রীষ্টের দেওয়া অবর্ণনীয় কৃপা-আশীর্বাদ সেই হিংসুটে শয়তানের কেড়ে নেওয়া আশীর্বাদের চেয়ে উত্তম।" সাধু টমাস আকুইনাস লিখেছেন, "মহত্তর কোনো কিছুর দিকে মানব স্বভাবের উন্নীত হবার পথে বাধা দেওয়ার মতো কোনো কিছু নেই, এমনকি পাপ করার পরও। ঈশ্বর মন্দতাকে ঘটতে দেন যেন তা থেকে আরও উত্তম কিছু বেরিয়ে আসতে পারে।" সাধু পল বলেন, "যেখানে পাপ বৃদ্ধি পেল, সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল" এবং পুণ্য শনিবার রাতের নিস্তার-বন্দনায় গাওয়া হয়, "ধন্য সেই অপরাধ... যার জন্য আমরা এমন মহান এক ত্রাণকর্তাকে পেয়েছি।"

খ্রীষ্টভক্তরা সব সময় বিশ্বাস করে,"এই জগৎ সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসা দিয়ে গড়া এবং এই ভালোবাসাই সৃষ্টিকে টিকিয়ে রেখেছে।"

কাজ : ব্যর্থতা বা মন্দ ঘটনা থেকে পরবর্তীতে ভালো কিছু অর্জিত হয়েছে এমন ঘটনা তোমার বেলায় ঘটে থাকলে বা তোমার জানা থাকলে তা সহভাগিতা করো।

পাঠ ৩ : ঈশ্বর-অন্বেষণে মানুষ

মানুষের জীবনের কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন হলো : আমি কে? আমি কোথা থেকে এসেছি? আমি কোথায় যাব? কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন? কেন তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন? এই প্রশ্নগুলোকে মহামানবেরা জীবন জিজ্ঞাসা বলে উল্লেখ করেছেন। জীবন জিজ্ঞাসা থেকেই শুরু হয় মানুষের ঈশ্বর-অন্বেষণ। মানুষ তার আপন স্রষ্টাকে খুঁজে পেতে চায়। তাঁর সাথে একাত্ম হতে চায়। তাঁর আপন স্রষ্টার মাহাত্ম্য মানুষ নিজ জীবনে উপলব্ধি করতে চায়। ঈশ্বরকে সে আস্বাদন করতে চায়, তিনি কত মঙ্গলময়। ঈশ্বরকে লাভ করা মানুষের অনন্ত পিপাসা। সামসংগীতেও আমরা মানুষের ঈশ্বর-অন্বেষণের বর্ণনা দেখতে পাই:

সামসংগীত ৬৩তে বলা হয়েছে :

ওগো, ঈশ্বর, তুমি তো আমার আপন ঈশ্বর, তোমাকেই খুঁজে ফিরি আমি;

তোমারই জন্যে তৃষিত আমার প্রাণ;

আমার এই দেহ তোমারই জন্যে ব্যাকুল,

যেন শুষ্ক তৃষাতুর জলহীন কোনো ভূমির মতো।

তাই তো এখন পুণ্য ধামের দিকে
ওগো, তোমারই দিকে তাকিয়ে রয়েছি আমি;
তোমার শক্তি, তোমার মহিমা দেখতেই চাই আমি ।

সামসংগীত ৪২-এ উল্লেখ করা হয়েছে :
জলস্রোতের জন্যে ব্যাকুল যেন হরিণীর মতো,
ওগো ঈশ্বর, তোমারই জন্যে ব্যাকুল আমার প্রাণ ।

পরমেশ্বর, আহা, জীবনেশ্বর–
তাঁরই জন্যে তৃষিত আমার প্রাণ ।
ঈশ্বরের কাছে, আহা, কবে যাব আমি,
কবে পাব তাঁর শ্রীমুখের দর্শন?

মানুষ কেন ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে? ঈশ্বর যিনি আমাদের স্রষ্টা তিনি নিজেই আমাদের সাথে মিলিত হতে চান । আমরাও যেন তাঁর সাথে মিলিত হতে চাই । সেজন্য তিনি সেই ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে দিয়েছেন । তিনি আমাদের মধ্যে এমন একটা অপূর্ণতা দিয়েছেন, যা একমাত্র তিনি নিজেই পূর্ণ করতে পারেন । নদীর জলের উৎস হলো সাগর এবং তার পরিণতিও হলো সাগর । মানুষের জীবনও তেমনি । আমাদের উৎস হলেন ঈশ্বর, আমাদের শেষ পরিণতিও তিনিই । আমরা তাঁর থেকে এসেছি, আমরা ফিরেও যাব তাঁর কাছে । যতদিন আমরা এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকি, তাঁরই গৌরবের জন্যেই বেঁচে থাকি । তাই মানুষ আমরা আমাদের জীবনের সব অবস্থায়, সব কাজে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে চাই । আমাদের জীবনে ঈশ্বরকে দেখতে চাই । আমাদের সব কাজের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে চাই । ঈশ্বরকে লাভ করে আমরা পরিতৃপ্ত হতে চাই । ঈশ্বরকে পেয়ে আমরা পূর্ণ হতে চাই ।

যুগ যুগ ধরে মানুষ নানাভাবে নানাস্থানে ঈশ্বরকে খুঁজেছে । সব ধর্মের মানুষের মধ্যেই আমরা দেখি যে মানুষ ঈশ্বর বা তাঁর আপন স্রষ্টাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে । মানুষের ধ্যান, প্রার্থনা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, পুণ্যকাজ, মানবসেবা, জ্ঞান অর্জন, তীর্থযাত্রা কিংবা সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ–এসব কিছুর মধ্য দিয়েই মানুষ তাঁর আপন স্রষ্টাকে খুঁজে বেড়ায় । সৃষ্টজীবের প্রতি ভালোবাসা ও নিজ অন্তরের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে মানুষ স্রষ্টাকে ভালোবাসে ও তাঁকে নিজ জীবনে অভিজ্ঞতা করে । কিন্তু অসীম ঈশ্বর আমার মধ্যেই আছেন । এই খুঁজে পাবার অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম তাইতো লিখেছেন :

অন্তরে তুমি আছো চিরদিন, ওগো অন্তরযামী ।
বাহিরে বৃথাই যত খুঁজি তাই পাই না তোমারে আমি ।
প্রাণের মতন আত্মার সম আমাতে আছো হে অন্তরতম ।...

২০২৫

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গেয়েছেন :

তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে
আরও কিছু নাহি চাই গো...

এভাবেই যুগের পর যুগ ধরে চলছে মানুষের বিরামহীন ঈশ্বর-অন্বেষণ ।

কাজ : তুমি কীভাবে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করো? তার একটি তালিকা করো। ঈশ্বরকে খুঁজে পাবার অভিজ্ঞতা ও আনন্দ দলে সহভাগিতা করো।

পাঠ ৪ : পরিত্রাণের উপায়

ঈশ্বরকে জানতে, তাঁর আজ্ঞাগুলো মেনে চলতে এবং এই পৃথিবী ও পরকালে পরম সুখে বাস করার জন্য ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন । কিন্তু মানুষ পাপ করে সেই সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছে । ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে । কিন্তু ঈশ্বর নিজেই উদ্যোগ নিয়ে মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন । তিনি মানুষকে পরিত্রাণ দিতে চান । পাপের কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষের প্রয়োজন ঈশ্বরের পরিত্রাণ । ঈশ্বরের কৃপা পেয়ে মানুষ পরিত্রাণের পথে এগিয়ে চলতে পারে। এই কৃপা ঈশ্বর মানুষকে দান করেন তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে। তাছাড়াও তিনি মানুষের জন্য দিয়েছেন বিধি-বিধান । এই বিধানের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ লাভ করবে ঐশ অনুগ্রহ ও পরিত্রাণ । এবার আমরা জানব কীভাবে পরিত্রাণ লাভ করা যায় ।

১. প্রভু যীশুকে মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করা : মুক্তি পরিকল্পনায় ঈশ্বর নিজেই মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি মানবজাতিকে পাপের হাত থেকে রক্ষা করবেন । সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুখ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে । যীশু মানুষ হয়ে পৃথিবীতে এসেছেন, পরিত্রাণ সম্পর্কে কথা ও কাজ দ্বারা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যন্ত্রণাভোগ এবং ক্রুশমৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়ে মানুষকে পরিত্রাণের পথ দেখিয়েছেন । তাহলে মানুষের পরিত্রাণের প্রধান উপায় হলো যীশুখ্রিষ্টকে মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করা । যীশু নিজেই বলেছেন, "আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন! আমাকে পথ করে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না ।" (যোহন: ১৪:৬) ।

২. নৈতিক বিধান পালন করা : পরিত্রাণ লাভের পথে ঈশ্বরের দেওয়া বিধি-বিধান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে । পুরাতন নিয়মের দশ আজ্ঞা, প্রভু যীশুর দেওয়া ভালোবাসার আজ্ঞা মানুষের পরিত্রাণের পথ নির্ণয় করে । একদিন একটি যুবক যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "গুরু, বলুন তো শাশ্বত জীবন লাভ করতে হলে আমাকে কোন্ সৎ কাজ করতে হবে? ... যীশু উত্তর দিলেন... জীবন রাজ্যে যদি প্রবেশ করতে চাও, তাহলে তুমি ঐশ আজ্ঞাগুলি পালন করে চল ।" ঐশ

আজ্ঞাগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা হলো ঈশ্বরকে ভালোবাসা ও প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে ভালোবাসা। এই ভালোবাসার বিধান পালন করেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি।

৩. ঐশ অনুগ্রহ ও ধর্মময়তা : ঐশ অনুগ্রহ ও ধর্মময়তা আসে পবিত্র আত্মা থেকে। পবিত্র আত্মার ক্ষমতাবলে আমরা পাপের দিক থেকে মরে গিয়ে নতুন জীবন অর্থাৎ পরিত্রাণ লাভ করি। পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের প্রথম ফল হলো মন পরিবর্তন। মন পরিবর্তন বলতে আমরা বুঝি পাপের পথ থেকে মন ফিরিয়ে যীশুর পথ গ্রহণ করা, পরিত্রাণ লাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা, পবিত্রতা লাভ করা ও বিশ্বাস নবীকরণ করা। এই ঐশ অনুগ্রহ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ঈশ্বরের দয়ার উপর। ঈশ্বরের নিজের জীবন থেকে তিনি তা আমাদের দিয়ে থাকেন।

৪. খ্রীষ্টমণ্ডলীর সদস্য হওয়া : খ্রীষ্টভক্তদের পরিত্রাণ সাধন করার জন্য প্রভু যীশু খ্রীষ্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছেন। মণ্ডলীতে স্বয়ং পবিত্র আত্মা বিরাজমান। মণ্ডলীর সহায়তায় সংস্কার প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এই সংস্কারগুলো হলো পরিত্রাণ লাভের পাথেয় স্বরূপ। যেমন দীক্ষাস্নান সংস্কার লাভের মধ্য দিয়ে ভক্তজনেরা আদি পাপের ক্ষমা লাভ করে, পুনর্মিলন সংস্কারের মধ্য দিয়ে পাপের ক্ষমা লাভ করে এবং খ্রীষ্টপ্রসাদ লাভের মধ্য দিয়ে অন্তরে প্রভু যীশুকে গ্রহণ করে। এছাড়াও মণ্ডলীর প্রার্থনা, উপাসনা ও অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষ পরিত্রাণদায়ী কৃপা লাভ করে। খ্রীষ্টভক্তের জীবনে মণ্ডলী হলো খ্রীষ্টের পরিত্রাণদায়ী বাস্তব উপস্থিতির প্রমাণ। মণ্ডলীর পরিচালনা ও খ্রীষ্টীয় দিক নির্দেশনার মাধ্যমে ভক্তজন পরিত্রাণের পথে এগিয়ে চলে।

৫. সেবাকাজ : সাধু যাকোব তাঁর ধর্মপত্রে বলেছেন, "কেউ যদি দাবি করে যে, ঈশ্বরে তার বিশ্বাস আছে, অথচ সে যদি সেইমতো কোনো সৎকর্ম না করে থাকে, তাহলে কীই বা লাভ তাতে? তেমন বিশ্বাস কি তাকে পরিত্রাণ এনে দিতে পারবে?" (যাকোব: ২:১৪)। সৎকর্মহীন বিশ্বাস নিষ্ফল, নিষ্প্রাণ। তাই আমাদের পরিত্রাণের জন্য যথাসাধ্য সেবাকাজ করতে হবে। সেবাকাজ করা খ্রিষ্টীয় দায়িত্ব। শেষ ভোজে শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে যীশু সে আদর্শ আমাদের জন্য রেখে গেছেন। সেবা কাজের মধ্য দিয়ে আমরা অন্তরের ধার্মিকতা ফিরে পাই।

কাজ ১ : পরিত্রাণ লাভের জন্য তুমি যা যা কর তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

কাজ ২ : কী কী ভাবে মানুষ ঈশ্বরের অন্বেষণ করে দলে ভাগ হয়ে তার একটি তালিকা তৈরি করে তা উপস্থাপন করো।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো

১. নিজের প্রতিমুর্তিতে সৃষ্ট মানুষকে ঈশ্বর ... ইচ্ছা দিয়েছিলেন।

২. পাপে পতিত হবার পূর্বে ... মধ্যে একটা সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

৩. কাইন তার আপন ভাই ... হত্যা করল।

৪. সব মানুষের মধ্যেই ভালো বা ... বিরাজমান।

৫. সত্য ও ... প্রতিষ্ঠা করা সব সময় সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো

বাম পাশ	ডান পাশ
১. মানুষ শয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে	• ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে চাই
২. পাপের ফলে এই	• আমরা পূর্ণ হতে চাই
৩. মানব ইতিহাসে	• সম্পর্ক নষ্ট হলো
৪. ঈশ্বর অসীমরূপে মঙ্গলময় ও	• ভালোবাসাপূর্ণ
৫. আমাদের সব কাজের মধ্য দিয়ে	• ঈশ্বরের অবাধ্য হলো

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কে আবেলকে হত্যা করল?

ক. আদম
খ. কাইন
গ. অব্রাম
ঘ. যাকোব

২. মানুষের মধ্যকার সুসম্পর্ক নষ্ট হয় কেন?

ক. পাপের ফলে
খ. যোগাযোগের অভাবে
গ. অন্যের ইচ্ছাকে প্রাধান্য না দিলে
ঘ. মন্দতার কারণে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ছোটবেলায় মিলন খুবই নম্র ও ভদ্র স্বভাবের ছিল। হাইস্কুলে উঠে সে দুষ্টু ছেলেদের সাথে চলাফেরা করে এবং পিতামাতার অবাধ্য হয়। নিয়মিত পড়ালেখা করে না, প্রার্থনাও খুব একটা করতে

২০২৫

চায় না। অর্থাৎ সে যে এখন অলস হয়ে গেছে তা তার ব্যবহারেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অবশেষে দেখা গেল সে অষ্টম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলো।

৩. কোন স্বভাবের বশবর্তী হয়ে মিলন মন্দ পথে অগ্রসর হলো?

ক. অসচেতনতা
খ. ধৈর্যহীনতা
গ. পাপস্বভাব
ঘ. অনৈতিকতা

৪. মিলনের এ ধরনের জীবন যাপনের কারণে সে–

i. ঈশ্বরকে ভয় পেতে শুরু করে
ii. ঐশ মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়
iii. পবিত্রতার কৃপা হারিয়ে ফেলে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ভেরোনিকা দরিদ্র পরিবারে লালিত পালিত হয়েছে। অনেক কষ্ট করে সে পড়ালেখা শিখেছে। সে প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করে, গির্জায় যায়, বেদি সাজায়, সাধু সাধ্বীদের জীবনীগ্রন্থ পাঠ করে। আধ্যাত্মিক জীবন যাপনে সে আনন্দ পায়। তার পিতামাতা তাকে বিয়ে দিতে চায় কিন্তু সে তাতে রাজি হয় না এই ভেবে যে ঐ জীবনে থেকে সে মণ্ডলীর লোকদের অনেক সেবা দিতে পারবে না। সে মানবিক দরদবোধ নিয়ে দুঃখী দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু তার ছোট ভাই সুজন ছিল খুবই আরামপ্রিয়। কষ্ট করা তার পছন্দ নয়। সে পিতামাতার অবাধ্য হয়ে চলে। পিতামাতার দেখানো পথে চলে না। একবার সে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। কোনো চিকিৎসায়ই সে ভালো হচ্ছিল না। ভেরোনিকা তাকে পরামর্শ দেয় যেন সে তার ভুল পথ থেকে ফিরে আসে।

ক. কার দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে মানুষ ঈশ্বরের অবাধ্য হলো?

খ. পাপে পতিত হওয়ার পূর্বে মানুষের জীবন কেমন ছিল তা বর্ণনা করো।

গ. ভেরোনিকা তার কাজের দ্বারা ঈশ্বরের কোন শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে চায়–আলোচনা করো।

ঘ. 'অনুশোচনা ও পাপ স্বীকারই সুজনকে সুস্থ করে তুলেছে' এ বিষয়ে তুমি কি একমত পোষণ করো? তোমার মতামত প্রদান করো।

২. রাজু শিশুকালেই তার বাবাকে হারায়। তার বাবা মারা যাওয়ার পূর্ব থেকেই তার বাবা, কাকা ও জেঠাদের মধ্যে জমিজমা নিয়ে ঝগড়া ও মামলা চলছিল। মামলার দুশ্চিন্তায় তার বাবা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়। বাবার অনুপস্থিতিতে যেখানে দুমুঠো ভাত খাওয়াই রাজুর জন্য কঠিন বিষয়, তার উপর প্রতি মাসে ২/১ বার করে কোর্টে হাজিরা দেওয়া ও তার জন্য টাকার ব্যবস্থা করা এক যন্ত্রণা। দুর্বিষহ যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের জন্য সে নিজে তার জেঠা-কাকাদের অনুরোধ করে যেন মামলা-মোকদ্দমা পরিহার করে সুন্দর জীবনে ফিরে আসা যায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে। জীবিতকালে রাজু তার বুদ্ধিমত্তা ও নমনীয় আচরণের দ্বারা মামলার ঝামেলা মেটাতে পেরেছে।

ক. আদি পিতামাতার কাছ থেকে আমরা কী বিষয়ে জেনেছি?

খ. দ্বন্দ্বমুখর জগতে কীভাবে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হয় ব্যাখ্যা করো।

গ. কী কারণে রাজুকে অপরিণত বয়সেই সংগ্রাম করতে হয়? পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষার আলোকে তা বর্ণনা করো।

ঘ. 'রাজু তার সংগ্রামী জীবনের উত্তরণে যেন পুনরুত্থিত খ্রিষ্টকে উপলব্ধি করতে পারে' বিষয়টির সাথে তুমি কি একমত পোষণ করো? তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আদিপাপের বিষয় আমরা কীভাবে জেনেছি?

২. ঈশ্বর মানুষের উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন কেন?

৩. মানুষ ঈশ্বরকে খোঁজে কেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. পাপে পতিত হওয়ার পর মানুষের কঠিন সংগ্রামপূর্ণ জীবনের বর্ণনা দাও।

২. পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় বর্ণনা করো।

৩. জীবনের সর্বাবস্থায় ঈশ্বরের উপর কীভাবে আস্থা রাখবে-ব্যাখ্যা করো।

পঞ্চম অধ্যায়

যীশুর বাণী প্রচারের মুলভাব

প্রভু যীশুখ্রীষ্ট পিতার ইচ্ছা অনুসারে এই জগতে এসেছেন মানবজাতির জন্য পরিত্রাণ সাধন করতে। প্রকাশ্য প্রচার জীবনে তিনি তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী ও আশ্চর্য কাজগুলোর মধ্য দিয়ে মানুষের উদ্দেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাঁর শিক্ষার মধ্যে রয়েছে সত্য ও সুন্দরের পথে জীবন যাপন এবং ন্যায্যতা, শান্তি ও ভালোবাসার পথ অনুসরণ করার মতো সকল বিষয়ের দিক নির্দেশনা। বাণী প্রচারের মাধ্যমে যীশুখ্রীষ্ট মানুষকে ধীরে ধীরে পরিত্রাণের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা প্রভু যীশুর বাণী প্রচারের প্রধান মুলভাবগুলোর উপর আলোকপাত করব।

যীশুর কাছে অসংখ্য জনতার ভিড়

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- যীশুর বাণী প্রচারের নিম্নলিখিত মুলভাবগুলো বর্ণনা করতে পারব;
- ঈশ্বরের রাজ্য, দশ আজ্ঞা, সুখপস্থাসমূহ, শেষ বিচার, মৃতদের পুনরুত্থান, যেরুসালেমের মন্দির, ইহুদিদের বিধান, শান্তি, দীনদরিদ্র, পবিত্র আত্মার নির্দেশ ও মিশনকর্ম এবং বিবাহের অবিচ্ছেদ্যতা।

আমরা যীশুর প্রচারিত বাণীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করব, যীশুর কাজে যথাসম্ভব অংশগ্রহণ করব।

২০২৫

পাঠ ১ : ঈশ্বরের রাজ্য

প্রতিটি মানবীয় কাজেরই একটি উদ্দেশ্য থাকে। উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো কাজকেই আমরা মানবীয় কাজ বলি না। আমরা যে পড়াশোনা করছি তার নিশ্চয়ই একটি কারণ রয়েছে। যেমন, আমরা লেখাপড়া শিখে বড় হবো, মানুষের মতো মানুষ হবো। প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশ ও সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করব। মানুষের মাঝে আমাদের কাজ দিয়ে উন্নত জীবন পথের সন্ধান দেবো। একইভাবে আমরা যে খাওয়াদাওয়া করি, বিশ্রাম করি, খেলাধুলা করি, গুরুজনদের বাধ্য হই ইত্যাদি সবকিছুরই একেকটি উদ্দেশ্য থাকে।

প্রভু যীশুখ্রীষ্ট এই জগতে এসেছেন একটি বিশেষ কাজ সম্পন্ন করতে– মানুষের পরিত্রাণ সাধন করতে। তিনি এসেছেন এই জগতের মাঝে ভালোবাসা, সেবা, ক্ষমা, একে অন্যের প্রতি মমতাবোধ, সহানুভূতি, ন্যায্যতা ও শান্তি স্থাপনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার করতে। এই কারণে প্রভু যীশু তাঁর বাণী প্রচার জীবনে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, ঐশরাজ্য কাছে এসে গেছে। তিনি চেয়েছেন মানুষ যেন মন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজ্যে প্রবেশের জন্য হৃদয়মন প্রস্তুত করে। প্রভু যীশুর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের রাজ্যের সূচনা এবং তাঁর মধ্য দিয়েই এই রাজ্য একদিন পূর্ণতা লাভ করবে। তিনি ভালোবাসা, ক্ষমা, সেবা ও মিলনের মধ্য দিয়ে এই জগতে তা প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন।

কিন্তু অনেকে যীশুকে ভুল বুঝেছে। তাঁকে অনেকে জাগতিক রাজা এবং তাঁর রাজ্যকে জাগতিক রাজ্য হিসাবে মনে করেছে। এমনকি তাঁর বারো জন শিষ্যের মধ্য থেকেও অনেকে প্রথম দিকে তাঁর রাজ্যের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারেননি। সেই কারণে প্রেরিত শিষ্য যাকোব ও যোহন প্রভু যীশুখ্রিষ্টকে অনুরোধ করে বলেছিলেন যে, তাঁদের একজন যেন একদিন তাঁর রাজ্যে ডান পাশে এবং অন্যজন তাঁর বা পাশে বসতে পারেন। তাঁদের বুঝতে ভুল হয়েছিল যে, ঈশ্বরের রাজ্য সবার জন্যই। সেখানে প্রবেশ করার অধিকার সকল মানুষেরই আছে। সেই রাজ্যে ডান পাশে বা বাম পাশে বসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ঈশ্বরের রাজ্যে আমরা সবাই সমান।

কাজ : সবাই মিলে, "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে"–গানটি করব।

পাঠ ২ : ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা

নিয়মকানুন মানুষকে সুশৃঙ্খল করে। সহজ-সরল ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। এই কারণে প্রতিটি সমাজ ও দেশে সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন রয়েছে। এগুলো পালনের মধ্য দিয়ে মানুষ সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণভাবে বাস করতে পারে।

সৃষ্টির শুরুতে ঈশ্বর প্রকৃতির মধ্যে কিছু নিয়ম দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি কিছু কিছু বিষয়ে বিধি-নিষেধও করেছেন। তিনি সিনাই পর্বতে মোশীর মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল জাতির জন্য দশটি আদেশ বা আজ্ঞা দান করেছেন। ঈশ্বরের সেই দশটি আজ্ঞা আমরা আগেই জেনেছি এবং সেগুলোর ব্যাখ্যাও শিখেছি।

কাজ : একজন একজন করে পাঁচজন ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা বলবে।

মোশীর মাধ্যমে ঈশ্বরের দেওয়া দশটি আজ্ঞার সারাংশ হিসেবে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দুইটি মূল আজ্ঞার মাধ্যমে আমাদের জন্য তুলে ধরেছেন। এভাবে তিনি দশ আজ্ঞার অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, তুমি তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, সমস্ত মন দিয়ে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসবে এবং প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসবে। সুতরাং দেখা যায় ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসার মধ্য দিয়ে প্রভু যীশু মোশীর মাধ্যমে দেওয়া দশটি আজ্ঞার পূর্ণতা দান করেছেন। ভালোবাসাই সমস্ত কিছু করতে পারে। পূর্ণ অন্তর, মন ও শক্তি নিয়ে যদি ঈশ্বরকে এবং সকল মানুষকে ভালোবাসা যায়, তাহলেই ঐশ বিধানের সমস্ত কিছু পালন করা হয়ে যায়। ভালোবাসা একমাত্র পথ যার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে আসতে পারি এবং সকল ভাইবোনদের অর্থাৎ সকল মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি। এই কারণে প্রভু যীশু পরস্পরকে ভালোবাসার কথা বলেছেন।

কাজ : কীভাবে তোমরা ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা অনুসারে জীবনযাপন করতে পারো তা দলে আলোচনা করবে।

পাঠ ৩: সুখপন্থাসমূহ

সব মানুষ জীবনে সুখী হতে চায়। মানুষের জীবনযাপন ও কাজকর্ম দেখলে উপলব্ধি করা যায় যে, মানুষের জীবনের প্রধান ও পরম লক্ষ্যই হলো সুখে থাকা। সুখের জন্যই যেন মানুষ এই পৃথিবীতে সবকিছু করে যাচ্ছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, সব ধরনের সুখ ও আনন্দ আমাদেরকে পরম বা স্থায়ী সুখ দিতে পারে না। দুই ধরনের সুখ আছে। যথা : জাগতিক সুখ ও পারমার্থিক সুখ। জাগতিক সুখভোগ হলো এই জগতের আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার মধ্য দিয়ে লব্ধ সুখভোগ। এগুলো আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ভোগ করে থাকি। মূলত পাওয়ার বা ভোগের মধ্য দিয়েই আমরা এসব সুখের সন্ধান করি। পারমার্থিক সুখ হলো ত্যাগের মধ্য দিয়ে, একে অন্যকে দান করার মধ্য দিয়ে এই সুখ লাভ করা যায়। এই সুখ এই জগতে আমরা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করি ও পরজগতের জন্য সঞ্চয় করি। প্রভু যীশু তাঁর প্রচার জীবনের শুরুতে জাগতিক সুখভোগের চেয়ে পারমার্থিক সুখভোগের কিছু পন্থা তুলে ধরেছেন। তিনি মোট আটটি সুখপন্থার কথা বলেছেন। এগুলো আমাদের কাছে অষ্টকল্যাণ বাণী নামেও পরিচিত।

সুখ পন্থাসমূহ বা অষ্টকল্যাণ বাণী

১। অন্তরে যারা দীন, ধন্য তারা–স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

২। দুঃখে-শোকে কাতর যারা, ধন্য তারা–তারাই পাবে সান্ত্বনা।

৩। বিনয়ী, কোমলপ্রাণ যারা, ধন্য তারা–প্রতিশ্রুত দেশ একদিন হবে তাদেরই আপন দেশ।

৪। ধার্মিকতার দাবি পূরণের জন্য তৃষিত ব্যাকুল যারা, ধন্য তারা–তারাই পরিতৃপ্ত হবে।

৫। দয়ালু যারা, ধন্য তারা–তাদেরই দয়া করা হবে।

৬। অন্তরে যারা পবিত্র, ধন্য তারা–তারাই পরমেশ্বরকে দেখতে পাবে।

৭। শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা–তারাই পরমেশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে।

৮। ধর্মনিষ্ঠ বলে নির্যাতিত যারা, ধন্য তারা–স্বর্গ রাজ্য তাদেরই।

প্রভু যীশুখ্রীষ্ট পর্বতে দেওয়া তাঁর এই আটটি কল্যাণ বাণীর মধ্য দিয়ে এই জগতে ও পর জগতে সুখলাভের পথ দেখিয়েছেন। এই বাণীর আলোকে জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে আমরা হৃদয় ও মনে শান্তি অনুভব করব ও সেই শান্তি একে অন্যের মাঝে বিলিয়ে দিতে পারব।

পাঠ ৪ : শেষ বিচার

মানুষ এ জীবনে ভালো ও মন্দ যেসব কাজ করে তার জন্য তাকে পুরস্কার ও শাস্তি ভোগ করতে হয়। এ জীবনে না হোক পরজীবনে তার এসব ভোগ করতে হয়। এই পৃথিবীতে যে যেমন জীবন যাপন করবে, সে ভাবেই সে পরজীবনের জন্য স্থান প্রস্তুত করবে। মানুষের জীবন যাপন ও কাজের উপর ভিত্তি করে শেষ বিচারের রায় হবে। যার যার কাজ অনুসারে তার তার বিচার হবে। মোটকথা সব মানুষকেই একদিন বিচার আসনের সামনে দাঁড়াতে হবে। খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা অনুযায়ী শেষ বিচার অবশ্যম্ভাবী। আমরা সবাই তা বিশ্বাস করি।

শেষ বিচারে মানব পুত্র (যীশুখ্রীষ্ট) আপন মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে স্বর্গদূতদের নিয়ে আসবেন এবং সিংহাসনে বসবেন। তাঁর সামনে সবাইকে তখন সমবেত করা হবে। বিচার হবে অনেকটা যেভাবে মেষপালক ছাগ থেকে মেষদের পৃথক করে নেয়, সেভাবে তিনি মানুষ থেকে মানুষকে পৃথক করবেন। ধার্মিক মানুষকে তিনি তাঁর ডান পাশে রাখবেন এবং মন্দ লোকদের তাঁর বাম পাশে রাখবেন। তাঁর ডান পাশের লোকদের তিনি বলবেন, তোমরা এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যারা। জগতের সৃষ্টির সময় থেকে তোমাদের জন্য যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা নিজেদের বলে গ্রহণ কর। কারণ তোমরা ক্ষুধার্তকে খেতে দিয়েছিলে, তৃষ্ণার্তকে জল দিয়েছিলে, বিদেশিদের আশ্রয় দিয়েছিলে, বস্ত্রহীনকে পোশাক পরিয়েছিলে, অসুস্থ ও পীড়িতকে সেবা করেছিলে, কারাবন্দিকে দেখতে গিয়েছিলে। এসব তুচ্ছতমদের জন্য তোমরা যা-কিছু করেছ, তা সবই আমারই জন্য করেছ।

অন্যদিকে অধার্মিকদের তিনি বলবেন, আমার সামনে থেকে দূর হও তোমরা, যত অভিশাপের পাত্র যারা। তোমাদের জন্য যে শাশ্বত আগুন প্রস্তুত করে রাখা আছে, সেখানেই যাও। কারণ তোমরা

ক্ষুধার্তকে খেতে দাও নি, তৃষ্ণার্তকে জল দাওনি, বিদেশিকে আশ্রয় দাওনি, বস্ত্রহীনকে পোশাক দাওনি, অসুস্থকে সেবা করনি, কারাবন্দিকে দেখতে যাওনি। তিনি তখন তাদের শাশ্বত দণ্ডলোকে পাঠিয়ে দেবেন।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি, আমাদের একদিন সবাইকে বিচারের আসনের সামনে দাঁড়াতে হবে। আমাদের বিচার হবে ভ্রাতৃপ্রেমের মানদণ্ডে অর্থাৎ আমরা এ জগতে তুচ্ছতম মানুষের জন্য কতটুকু করেছি তার উপর ভিত্তি করে।

কাজ : আমরা কী কী কাজ করলে শাশ্বত জীবনলোকে যেতে পারব তার একটা তালিকা প্রস্তুত করব।

পাঠ ৫ : মৃতদের পুনরুত্থান

আমরা যেমন একদিন এ জগতে জন্মগ্রহণ করেছি, তেমনি এ জগতের মায়ামোহ পরিত্যাগ করে একদিন আমাদের পিতার কাছে চলে যেতে হবে। যেহেতু মৃত্যুটা আমরা কেউ কখনো কামনা করি না, তাই তা নিয়ে আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন জাগে। মৃত্যু কেন হয়? মৃত্যুর পর আমাদের কী হবে? আমরা কোথায় যাব? ইত্যাদি। কারণ এ ধরনের অজানা বিষয়ের প্রতি সব মানুষের এক ধরনের উৎকণ্ঠা কাজ করে। সেই কারণে মৃত্যুর পরের জীবন নিয়ে কমবেশি সবারই উৎকণ্ঠার শেষ নেই।

পুনরুত্থিত প্রভু যীশু

আমরা মৃতদের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করি। কারণ প্রভু যীশুখ্রীষ্ট নিজে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তিন দিন পর পুনরুত্থান করেছেন। তিনি পুনরুত্থান করে আমাদেরকেও তাঁর পুনরুত্থানের সহভাগী করেছেন। তিনি তাঁর প্রচার জীবনেও পুনরুত্থানের বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন। ইহুদিরা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু অন্যদিকে সাদুকীরা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতেন না। এই সাদুকীরা যখন যীশুকে পুনরুত্থানের বিষয় প্রশ্ন করেন তখন তিনি তাদের পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, মৃতদের একদিন পুনরুত্থান ঘটবে। তবে পুনরুত্থানের পর মানুষ আর এই জগতের মানুষের মতো সবকিছু করবে না। পুনরুত্থানের পর তারা সবাই স্বর্গদূতদের মতো হয়ে উঠবে। তাদের চেহারার মধ্যে সেই স্বর্গদূতদের মতো ভাব ফুটে উঠবে। এই কারণে প্রভু যীশু যখন পুনরুত্থান করে শিষ্যদের সাথে দেখা দিয়েছেন তখন তাঁরা তাঁকে প্রথমে চিনতে পারেননি। যীশু বলেন, পরমেশ্বর তো মৃতদের ঈশ্বর নন, তিনি জীবিতদের ঈশ্বর। আমরা প্রত্যেকে একদিন পুনরুত্থান করব। কারণ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমরা মহান ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করব। সেই কারণে মৃত্যু কষ্টের নয়; বরং খ্রিষ্ট বিশ্বাসী সবার জন্য তা মহা আনন্দের হওয়া উচিত।

পাঠ ৬ : যেরুসালেম মন্দির

প্রতিটি ধর্মেই ধর্মীয় অনুশীলনের জন্য বা উপাসনার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকে। যেমন, ইসলাম ধর্মে আছে মসজিদ, হিন্দু ধর্মে মন্দির, বৌদ্ধধর্মে প্যাগোডা এবং খ্রিষ্টধর্মে আছে গির্জা, মন্দির বা উপাসনালয়। এই পবিত্র স্থানগুলো সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতির চিহ্ন বহন করে।

প্রভু যীশুখ্রীষ্টের সময়ে ইহুদিদের উপাসনার প্রধান কেন্দ্র ছিল যেরুসালেম মন্দির। বছরের বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষ্যে ইহুদিরা একত্রে মিলিত হতো। প্রভু যীশুখ্রীষ্টের যেরুসালেম মন্দিরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর জন্মের চল্লিশ দিন পরে যোসেফ ও মারীয়া তাঁকে এই মন্দিরে উৎসর্গ করেছিলেন। বারো বছর বয়সে তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে এই মন্দিরেই পাওয়া গিয়েছিল। এই ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পিতার কাজেই তাকে ব্যস্ত থাকতে হবে। তাঁর প্রকাশ্য জীবনে প্রতি বছর অন্ততপক্ষে নিস্তার পর্বের সময় তিনি যেরুসালেম মন্দিরে যেতেন।

এই মন্দির হলো ঈশ্বরের গৃহ, যেখানে সকল জাতির মানুষ এসে প্রার্থনা করবে। সেই কারণে প্রভু যীশু একবার মন্দিরে ঢুকে যখন দেখলেন মন্দিরের পবিত্র স্থানটি বেচা-কেনার বাজারে পরিণত হয়েছে তখন তিনি তাদের বের করে দিলেন। বেচা-কেনার সবকিছু তিনি উল্টে ফেলে দিলেন। তিনি পিতার গৃহের পবিত্রতা নষ্ট হতে দেননি।

পাশাপাশি প্রভু যীশু দেহ মন্দিরের কথাও বলেছেন। আমাদের দেহ হলো ঈশ্বরের মন্দির। এই হৃদয়রূপী পুরনো মন্দির তিনি ভেঙে ফেলে তিন দিনের মধ্যে নতুন হৃদয় মন্দির গড়তে চেয়েছেন। যদিও অনেকে তাকে ভুল বুঝেছে, তারপরও তিনি যেরুসালেম মন্দিরকে তার প্রচারের কেন্দ্র করেছিলেন। এই যেরুসালেমেই তিনি পিতার ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছিলেন।

পাঠ ৭ : ইহুদিদের বিধান

সব ধর্মেই কিছু-না-কিছু নিয়মকানুন বা বিধি বিধান থাকে। এই নিয়ম বা বিধান পালনের মধ্য দিয়ে প্রথমত ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বিধি-বিধান পালনের মধ্য দিয়ে মানুষ সত্য পথে পরিচালিত হতে পারে ও স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করতে পারে।

ইহুদিধর্মের অনেক নিয়মকানুন বা বিধিবিধান একান্ত পালনীয় ছিল। অনেকে মনে করেছিল প্রভু যীশু সব নিয়মকানুন বা বিধিবিধান বাতিল করতে এসেছেন। কিন্তু তিনি নিজেই পর্বতের উপর উপদেশে এই বিষয়ে বলেছেন, "তোমরা এই কথা মনে করো না যে, আমি মোশীর বিধান বা প্রবক্তাদের নির্দেশ বাতিল করতে এসেছি। আমি তা বাতিল করতে আসিনি বরং পুর্ণ করতে এসেছি। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আকাশ ও পৃথিবী যতদিন বিলুপ্ত না হয়, ততদিন বিধানের বিন্দুবিসর্গও লোপ পাবে না: তার আগেই যা-কিছু ঘটবার কথা সবই ঘটবে। তাই এই সব আদেশের মধ্যে গৌণতম আদেশগুলোর একটিও যদি কেউ লঙ্ঘন করে আর অপরকে লঙ্ঘন করতে শেখায়, তাহলে স্বর্গরাজ্যে সে তুচ্ছতম বলেই গণ্য হবে। কিন্তু যদি কেউ সেই সব আদেশ পালন করে ও পালন করতে শেখায়, তাহলে স্বর্গরাজ্যে সে মহান বলেই গণ্য হবে" (মথি ৫:১৭-১৯)।

যীশুখ্রীষ্ট ধর্মের আসল উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য এই বিধানগুলো পালনে আরও বেশি করে বিশ্বস্ত হতে বলেছেন। এগুলো পালন সম্পর্কে তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন তা আরও বেশি কঠিন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন, "তোমরা শুনেছ যে, প্রাচীনকালের মানুষদের এই কথা বলা হয়েছিল– হত্যা করবে না; যে কেউ হত্যা করবে, তাকে তার জন্য বিচারসভায় জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি– যে কেউ নিজের ভাইয়ের উপর রাগ করবে, তাকে তার জন্যে বিচারসভায় জবাবদিহি করতেই হবে। আর ভাইকে যে অপদার্থ বলবে, তাকে তো মহাসভাতেই জবাবদিহি করতে হবে। আর ভাইকে যে পাষণ্ড বলবে, তাকে নরকের আগুনেই জবাবদিহি করতে হবে" (মথি ৫:২১-২২)।

প্রভু যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সমস্ত কিছু পূর্ণতা লাভ করেছে। তাই যারা এই বিধান পালন করে ও অন্যকে পালন করতে শিক্ষা দেয় তারা স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গণ্য হবে। এই বিধিবিধান ঐশরাজ্যে প্রবেশ করতে আমাদের সাহায্য করে। প্রভু যীশুখ্রীষ্ট সমস্ত বিধানের একটি নতুন রূপ দান করেছেন। ইহুদিরা তা আক্ষরিকভাবে পালন করত। কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট তার আধ্যাত্মিক রূপ দান করেছেন। তাঁর বিধান হলো ভালোবাসার বিধান।

কাজ : কেন নিয়ম পালন করতে হয় তা দলীয়ভাবে আলোচনা করবে।

পাঠ ৮ : শান্তি

সব মানুষই শান্তি কামনা করে। একটু সুখের, একটু শান্তিতে জীবনযাপন করার জন্য মানুষ কত কী-ই না করে থাকে। অনেকে আবার দূরদূরান্তে পাড়ি জমায় একটু শান্তির আশায়।

যীশুখ্রীষ্ট হলেন শান্তিরাজ। শান্তিরাজ প্রভু যীশুর জন্মের হাজার হাজার বছর আগে বিভিন্ন প্রবক্তা ত্রাণকর্তার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে এই আখ্যাই দিয়েছেন। তিনিই 'অনন্য মন্ত্রণাদাতা', 'বিশ্ব শান্তিরাজ'।

যীশু তাঁর প্রচার জীবনে মানুষের মাঝে শান্তি বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমাদের জন্যে শান্তি রেখে যাচ্ছি, তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি আমারই শান্তি।' মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পর যখন তিনি শিষ্যদের কাছে দেখা দিয়েছেন,তখন শিষ্যদের মাঝে শান্তি বিলিয়ে দিয়ে বলেছেন 'তোমাদের শান্তি হোক।' তবে প্রভু যীশুর দেওয়া শান্তি, এ জগতে দেওয়া শান্তির চেয়ে ভিন্নতর। প্রভু যীশুর দেওয়া শান্তির উৎস বা ভিত্তি হচ্ছে ন্যায্যতা, ত্যাগ ও আত্মদান। ভোগে নয় ত্যাগের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের মাঝে তাঁর শান্তি বিলিয়ে গেছেন, যেন আমরা সবাই শান্তির মানুষ হতে পারি।

প্রভু যীশু ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষকে পুনর্মিলিত করেছেন এবং মণ্ডলীকে করে তুলেছেন মানবজাতির মধ্যে ঐক্যের এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর মিলনের চিহ্ন। কেননা তিনি নিজেই আমাদের মাঝে শান্তি দিতে এসেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, শান্তির সাধক যারা তারাই সুখী হবে।

কাজ : নিজ বাড়ি ও শ্রেণিকক্ষে সর্বদা শান্তি বজায় রাখার জন্য করণীয়সমূহ বাড়ি থেকে লিখে আনবে।

পাঠ ৯ : দীন-দরিদ্র

যীশুখ্রীষ্ট পর্বতের উপর যে কথা বলে তাঁর উপদেশবাণী শুরু করেছেন তা হলো, "অন্তরে যারা দীন, ধন্য তারা–স্বর্গরাজ্য তাদেরই।" প্রভু যীশু ঈশ্বর-পুত্র হয়েও অতি দীন বেশে এই জগতে এসেছেন। অতি সাধারণ একটি কন্যা, কুমারী মারীয়ার গর্ভে এসে দীন-দরিদ্র বেশে গোশালায় জন্মগ্রহণ করলেন।

তিনি এই জগতে এসেছেন অতি সাধারণ বেশে, দীন-দরিদ্রদের মাঝে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করতে। নাজারেথের সমাজগৃহে যীশুখ্রীষ্ট প্রবক্তা ইসাইয়ার ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে এ জগতে তাঁর আসার কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। "তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীন-দরিদ্রদের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে; বন্দির কাছে মুক্তি আর অন্ধের কাছে নবদৃষ্টি লাভের কথা ঘোষণা করতে, পদদলিত মানুষকে মুক্ত করে দিতে" (লুক ৪:১৮)। তিনি তাঁর প্রচারজীবনে যে বারোজনকে মনোনীত করেছেন তারা সবাই সাধারণ মানুষ ছিলেন। যাদের কাছে মঙ্গলবাণী প্রচার করেছেন তারাও সমাজের

অবহেলিত, লাঞ্ছিত, অভাবী, দুঃখী, বিধবা, অসুস্থ, পঙ্গুদের কাছে তাঁর আশার বাণী ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, পিতা ঐশ রাজ্যের মর্মসত্য সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন জ্ঞানীদের লজ্জা দেবার জন্য। তিনি সবাইকে শিশুর মতো সরল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ শিশুর মতো সহজ-সরল হতে না পারলে কেউ ঐশ রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

পাঠ ১০ : পবিত্র আত্মার বাণী ও প্রেরণকর্ম

প্রভু যীশু এই জগৎ ছেড়ে পিতার কাছে চলে যাবার আগে বলেছেন যে, তিনি তাঁর অনুসারীদের অনাথ করে রেখে যাবেন না। তিনি এক সত্যময় আত্মা আমাদের দান করবেন, যিনি পূর্ণ সত্যের পথে আমাদের পরিচালিত করবেন। পবিত্র আত্মার বাণী পথপ্রদর্শক হবে এবং তাঁর শক্তিতে প্রেরণকর্ম পরিচালিত হবে।

পিতা যখন তাঁর বাণী প্রেরণ করেন, তিনি সব সময়ই তাঁর প্রাণবায়ুকেও দান করেন। পুত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর বাণী আমাদের মাঝে এসেছে। কিন্তু আত্মা আমাদের বুঝিয়ে দেন যে, যদিও প্রেরণকর্মে পুত্র ও আত্মা স্বতন্ত্র তবুও অবিচ্ছেদ্য। অদৃশ্য ঈশ্বরের দৃশ্যমান প্রতিমূর্তি খ্রীষ্টকে আমরা দেখতে পাই বটে, কিন্তু তাঁকে প্রকাশ করেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা। সেই কারণে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট বলেন যে, যখন আমারই কারণে তোমাদের সমাজগৃহে বা শাসনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন কীভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে তা নিয়ে কোনো চিন্তা কোরো না। তোমাদের তখন যা-কিছু বলতে হবে তা পবিত্র আত্মাই শিখিয়ে দেবেন। প্রেরণকর্মে পবিত্র আত্মার বাণীই হবে আমাদের চালিকাশক্তি। পবিত্র আত্মা আমাদের ঈশ্বর সন্তানে পরিণত করবেন। তাঁর কাজ হচ্ছে আমাদেরকে খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত করা ও খ্রীষ্টের আশ্রয়ে জীবনযাপন করতে সহায়তা করা।

অনুসন্ধানমূলক কাজ : ধর্মপল্লিতে খ্রীষ্টমণ্ডলী কী কী প্রেরণকর্ম করছে এবং সেই কাজগুলোর মাধ্যমে সমাজের লোকদের কী কী উপকার সাধিত হচ্ছে তার উপর একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করো।

পাঠ ১১ : বিবাহের অবিচ্ছেদ্যতা

আমরা জানি, বিবাহ সাক্রামেন্ত অনুষ্ঠিত হয় একজন ছেলে (পুরুষ) ও একজন মেয়ের (নারী) মধ্যে। তারা সারা জীবন একসাথে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে গির্জায় গিয়ে যাজকের উপস্থিতিতে ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করে। ঈশ্বর নিজেই তাদের মিলন করিয়ে দেন। তাই সারাজীবন তারা একসাথে থাকে। একমাত্র মৃত্যু এই বন্ধন ছিন্ন করতে পারে, আর কেউ নয়।

ঈশ্বর মানুষকে পুরুষ ও নারী করেই সৃষ্টি করেছেন যেন তাদের সম্মিলিত জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে মানুষের মাঝে পরিপূর্ণতা আসে। পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করে তিনি বিবাহ ব্যবস্থার দ্বারা জীবন ও প্রেমের যে ঘনিষ্ঠ মিলন ঘটে তা প্রকাশ করেছেন। স্বয়ং ঈশ্বরই বিবাহবন্ধনের রচয়িতা। সেই

২০২৫

কারণে বিবাহ শুধু যে একটি সামাজিক বা মানবীয় ব্যবস্থা, তা নয়। বরং দাম্পত্যজীবনে নর-নারীর সাথে ঈশ্বরের এক অবিচ্ছেদ্য মিলন সংঘটিত হয়, যা কখনো ভাঙার নয়। শাস্ত্রবাণী স্মরণ করিয়ে দেয়, 'তারা আর দুইজন নয়, কিন্তু একদেহ।'

যীশুখ্রীষ্ট দাম্পত্যজীবনের এই প্রেমের মিলনকে শ্রদ্ধা করেছেন। তিনি তাঁর প্রকাশ্য জীবনের শুরুতে তাঁর মায়ের সাথে কানা নগরের বিবাহ উৎসবে যোগ দিয়েছেন। তাঁর উপস্থিতি প্রকাশ করে এখন থেকে বিবাহ হবে খ্রীষ্টের উপস্থিতির ফলপ্রসূ চিহ্ন। আদি থেকেই সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনায় নর-নারীর মিলনের যে মূল অর্থ ছিল প্রভু যীশু তাঁর প্রচার জীবনে সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। কারণ ঈশ্বর তা নিজেই স্থির করে দিয়েছেন। তিনি অতিরিক্ত কোনো বোঝা চাপিয়ে দেননি যা মোশীর বিধানের চেয়ে ভারী। তিনি বলেন, "ঈশ্বর যা যুক্ত করেছেন, মানুষ যেন তা বিচ্ছিন্ন না করে।" যেন বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা, মাধুর্য, সৌন্দর্য ও অনুগ্রহ অক্ষুণ্ন থাকে। যেন পারস্পরিক সম্মান, মর্যাদা ও ভালোবাসা স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো

১. আমরা মৃতদের ... বিশ্বাস করি।

২. মন্দির হলো ... গৃহ।

৩. ঈশ্বরের বিধান হলো ... বিধান।

৪. খ্রীষ্ট হলেন ...।

৫. যীশুখ্রীষ্ট দাম্পত্যজীবনের প্রেমের মিলনকে ... করেছেন।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো

বাম পাশ	ডান পাশ
১. প্রেরণকর্মে পবিত্র আত্মার বাণীই হবে	• ধন্য তারা, স্বর্গরাজ্য তাদেরই
২. অন্তরে যারা দীন	• সবার জন্যই
৩. পবিত্র আত্মার বাণী	• আমাদের চালিকাশক্তি
৪. ঈশ্বরের রাজ্য	• ঈশ্বরকে ও প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে
৫. তোমার সমস্ত অন্তর, মন দিয়ে	• পথপ্রদর্শক হবে
	• পরস্পরকে ভালোবাসার কথা বলেছেন

৩. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মৃত্যুর কত দিন পর যীশু পুনরুত্থান করেছেন?

ক. দুই দিন   খ. তিন দিন

গ. চার দিন   ঘ. পাঁচ দিন

২. কীভাবে আমরা ঈশ্বরের কাছে আসতে পারি?

ক. ভালোবাসার মাধ্যমে   খ. অনুগ্রহের মাধ্যমে

গ. অনুদান দিয়ে   ঘ. বিধিবিধান পালন করে।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

মিথুন লেখাপড়ায় দুর্বল হলেও ঈশ্বরভীরু ও পরোপকারী। খুব সহজেই অন্যকে সে আপন করে নেয়। কারো সাথে বিবাদ হলে নিজেই মীমাংসা করে। অবহেলিত মানুষের জন্য যথাসম্ভব কাজ করে। তাকে দেখে অনেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজের কল্যাণে কাজ করে।

৩. মিথুনের এই কাজগুলোর মাধ্যমে কিসের প্রকাশ ঘটেছে?

ক. জাগতিক রাজ্যের   খ. ঐশরাজ্যের

গ. আধিপত্য বিস্তারের   ঘ. সৃষ্টির লালনের

৪. মিথুন তার কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে চায়–

i. ভালোবাসা, সেবা

ii. ক্ষমা, শান্তি

iii. মমতাবোধ ও সহানুভূতি।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii

গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অপু ও তপু দুজনেই ধনী পরিবারের সন্তান। অপু অবাধ্য, লেখাপড়া করে না, রাত করে ঘরে ফেরে। বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা করে না। অন্যদিকে তপু ঈশ্বরভীরু ও প্রার্থনাশীল। সকলের সেবা ও সহযোগিতা করে। তপুর জীবন দেখে অপু আফসোস করে এবং মন পরিবর্তন করে।

২০২৫

দুজনে সহজ সরলভাবে জীবন যাপন করে। সাধারণ খাবার খায়। পোশাকেও শালীনতা বজায় রাখে। দুজনেই প্রার্থনা করে এবং সমাজের দীন-দরিদ্র, দুঃখী, বিধবা ও অসুস্থ লোকদের মাঝে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করে। ঐশবাণীর মর্মসত্য তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করতে থাকে। ফলে সকলেই আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ক. ঈশ্বরের রাজ্য কাদের জন্য?

খ. আমরা কীভাবে সুখ লাভ করতে পারি?

গ. অপু ও তপু কোথাকার বাসিন্দা? ব্যাখ্যা করো

ঘ. অপু ও তপুর মধ্যে যেন ঈশ্বরের সন্তানের ছায়া পড়েছে– উক্তিটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করো।

২. সঞ্জিত সর্বদা সত্য কথা বলে, কারণ সে ঈশ্বরকে ভয় করে। সে নিয়মিত বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা করে। তার বাড়ির পাশের যে অসহায় মানুষ রয়েছে তাদের অর্থ, খাদ্য, পোশাক ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করে। কেউ অসুস্থ হলে আগেই এগিয়ে যায়। প্রয়োজনে হাসপাতালে নিয়ে যায়। যাজক তার এই কাজের আগ্রহ দেখে সঞ্জিতকে ডেকে বললেন, 'তোমার কল্যাণ হউক।' কিন্তু সে নিজেকে সব সময়ই ক্ষুদ্র মনে করো।

ক. শেষ বিচারের দিনে কাকে ঈশ্বর ডান পাশে রাখবেন?

খ. আমরা কেন মৃতদের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করি?

গ. সঞ্জিতের কাজের মাধ্যমে কোন শিক্ষাটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সঞ্জিতের এ কাজের ফল কী হতে পারে? তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রভু যীশু কোন বিশেষ কাজ করতে পৃথিবীতে এসেছেন?

২. দশ আজ্ঞার অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করো?

৩. সুখপন্থাগুলোর আলোকে জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে কী করতে পারব?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে তোমার নিজের ভাষায় লেখো।

২. সুখপন্থাগুলো কী কী?

৩. মৃতদের পুনরুত্থান সম্পর্কে তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে লেখো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যীশুর আহ্বানে পিতরের সাড়াদান

সাধু পিতর

যীশু তাঁর বাণী প্রচারের কাজে বারোজন অনুসারীকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁদেরকে তিনি আহ্বান করেছেন এবং তাঁরাও সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে যীশুর শিষ্য হয়ে উঠেছেন। তাঁদের তিনি নাম দিয়েছেন প্রেরিতশিষ্য বা প্রেরিতদূত। কারণ তাঁরা জগতের সর্বত্র প্রেরিত হয়েছিলেন। সাধু পিতর ছিলেন প্রেরিতদের মধ্যে প্রধান। এই অধ্যায়ে সাধু পিতরের আহ্বান ও তাঁর সাড়াদান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার মাধ্যমে আমরা সাধু পিতরের আদর্শে যীশুর প্রিয় শিষ্য হয়ে ওঠার চেষ্টা করব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- যীশু কর্তৃক পিতরের আহ্বান ও যীশুর আহ্বানে পিতরের সাড়াদান ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পিতরের উপর যীশুর অর্পিত দায়িত্বসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- খ্রীষ্টমণ্ডলীর ভিত্তি হিসেবে পিতরের বিষয় বর্ণনা করতে পারব;
- পিতরের পুনরুত্থানের সাক্ষী হওয়ার কথা বর্ণনা করতে পারব;
- মণ্ডলীতে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পিতরকে যে অধিকার ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা বর্ণনা করতে পারব;
- পিতরের মসীহ বলে স্বীকারোক্তি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারব;
- যীশুর যোগ্য শিষ্য হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হব।

পাঠ ১ : পিতরের আহ্বান ও সাড়াদান

পিতা ঈশ্বরের মুক্তি-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে যীশু এ জগতে এসেছেন। তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে মুক্তির বাণী সবাইকে শুনিয়েছেন এবং আহ্বান করেছেন যেন সবাই তাঁর দেখানো ধর্মপথে চলে। তিনি স্বর্গরাজ্যে যাওয়ার পথ দেখিয়েছেন। ধর্মের এই বাণী প্রচার করা সহজ কাজ ছিল না। এর জন্য তাঁকে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে। তবে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, তিনিই পথ, সত্য ও জীবন। তাঁর মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।

যীশু তার জীবনকালে তাঁর অনুসারীদের মধ্য থেকে কয়েকজন মনোনীত করেছিলেন বাণী প্রচারের কাজ করার জন্য। প্রচার কাজে প্রেরণ করার আগে তিনি তাদেরকে গঠন দিয়েছিলেন। স্বর্গরাজ্যের গোপন রহস্য তিনি শিশুর মতো সরল হৃদয় এই শিষ্যদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন।

যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পরে শিষ্যেরা যাতে জগতের সকল প্রান্তে গিয়ে তাঁর পরিত্রাণের বাণী প্রচার করতে পারেন, এই জন্যে তাদের উপর তাঁর পবিত্র আত্মাকে দান করেছিলেন। এই পবিত্র আত্মার শক্তিতে শক্তিমান হয়েই প্রেরিত দূতেরা সকল কষ্ট নির্যাতন ও ভয়ভীতি উপেক্ষা করে দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সাক্ষ্য বহন করেছিলেন। আজও আমরা সেই একই পবিত্র আত্মাকে পেয়ে যীশুর সাক্ষ্য বহন করার জন্য আহূত এবং প্রেরিত।

এই বারোজন প্রেরিতদূত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে যীশুর সংস্পর্শে এসেছেন। একই এলাকার বাসিন্দা হিসেবে হয়তো তাঁরা ছোটবেলা থেকেই পরস্পরের পরিচিত ছিলেন। আবার মন্দিরে যীশুর হারিয়ে যাওয়া, পণ্ডিতদের সাথে তত্ত্বালোচনা, কানা নগরের বিয়েবাড়িতে আশ্চর্যকাজ এসব কারণেও যীশু তাঁর নিজ এলাকায় সকলের কাছে পরিচিত হয়ে থাকতে পারেন। এসব ঘটনার শ্রোতা হিসেবে শিষ্যেরা হয়তো আগে থেকেই যীশুর পরিচয় জানতে পেরেছিলেন। কেউ কেউ হয়তো দীক্ষাগুরু যোহনের কাছ থেকে যীশুর পরিচয় শুনে থাকতে পারেন। ফলে যীশুকে দেখার কিংবা তাঁর সংস্পর্শে যাওয়ার ইচ্ছা হয়তো তাঁদের অন্তরে আগে থেকেই ছিল।

তখনকার বাস্তবতায় সাগর তীরে ছোট ছোট নগর বা বসতি গড়ে উঠেছিল। আর যীশু সাগর তীরের এসব নগর-বন্দর ঘুরে ঘুরে বাণী প্রচার করেছিলেন। নৌকা, মাঝি ও জেলে ছিল যীশুর প্রচার কাজের মাধ্যম। শিষ্যদের যীশুকে দেখার সুপ্ত বাসনাটি পূর্ণ হয়, যখন যীশু শিষ্যদের নিজ নিজ এলাকায় প্রচার করতে যান। ফলে যীশুর সঙ্গে তাঁদের সরাসরি দেখা হয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে পিতরও ছিলেন। সেখানেই যীশুর শিষ্য হওয়ার জন্য তাদের প্রতি চূড়ান্ত আহ্বান আসে। সাধু লুক খুব চমৎকারভাবে তাঁর লেখা মঙ্গলসমাচারে এই ঘটনাটি প্রকাশ করেছেন।

জেলেরা সারা রাত জাল ফেলে কোনো মাছ ধরতে পারেননি (লুক ৫:১-১২)। তাঁদের জন্য সেই রাতটি খুব হতাশার ও ক্লান্তিকর ছিল। সকালে যীশুকে তীরে দেখতে পেয়ে পিতর লাফ দিয়ে যীশুর

কাছে আসেন। তাঁদের ব্যর্থ অভিযানের কথা যীশুর সাথে সহভাগিতা করেন। এই পরিস্থিতিতে যীশু পিতরকে বললেন, "নৌকাটা এবার গভীর জলে নিয়ে যাও আর মাছ ধরার জন্য জাল ফেল।" সারা রাতের ব্যর্থতা ও ক্লান্তির জন্য যীশুর এই আদেশ পিতরের কাছে অযৌক্তিক মনে হয়েছিল। তাঁর মধ্যে কিছুটা ইতস্তত ভাব থাকলেও যীশুর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও আস্থার ফলেই তিনি যীশুর কথার বাধ্য হলেন। তাঁরা সাগরে জাল ফেললেন। আর কী আশ্চর্য! আশ্চর্য!

এত মাছ ধরা পড়ল যে জালটা ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো! ফলে অন্য জেলেদের সহযোগিতা নিতে হলো আর প্রচুর মাছ ধরা পড়ল। যীশুর সম্বন্ধে শিষ্যেরা যা শুনেছিলেন, আজ নিজেদের চোখেই তাঁরা তা দেখলেন। তা সত্যিই আশ্চর্য কাজ। তাঁরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। আরও আশ্চর্য ব্যাপার হলো এই যে, যখন তাঁরা যীশুর আহ্বান পেলেন, "এখন থেকে মানুষই ধরবে তোমরা।" ফলে জেলেদের জীবনে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। শুধু যে প্রচুর মাছই ধরা পড়ল, তা নয়। এবার তাদের জীবনটাই যীশুর কাছে ধরা পড়ে গেল। তাঁরা আর মাছ ধরার জেলে রইলেন না, বরং মানুষ ধরার জেলে হয়ে গেলেন। অর্থাৎ এবার তাঁরা যীশুর প্রচার জীবনের সঙ্গী হয়ে গেলেন। আশ্চর্য ঘটনা এই যে, তাঁরা তাঁদের জাল, নৌকা, মাছ, বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজন সব ফেলে রেখে যীশুর সঙ্গ নিলেন। তাঁদের মধ্যে পিতরও ছিলেন।

যীশুর কী আশ্চর্য ক্ষমতা! কত সহজেই না তিনি পিতরকে তাঁর দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্ত করে ঈশ্বরের সেবা কাজে নিয়োজিত করলেন। যীশুর মুখের কথা, চোখের দৃষ্টি পিতরের মন আকর্ষণ করেছিল। সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। এ এক চমৎকার আহ্বান– একটি আধ্যাত্মিক আহ্বান। ঈশ্বরের সেবা করার আহ্বান। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে পিতর সবকিছু ফেলে রেখে যীশুর সঙ্গ নিলেন।

কাজ : যীশুর আহ্বানে পিতরের সাড়াদানের ঘটনাটি দলীয়ভাবে অভিনয় করে দেখাও।

পাঠ ২ : দায়িত্ব অর্পণ ও মণ্ডলীর ভিত্তি

সাধু পিতর গালিলেয়া প্রদেশের বেথসাইদা গ্রামের লোক ছিলেন। তাঁর অন্য আরেকটি নাম হলো শিমন। শিমনকে যীশুই পিতর নাম দিয়েছিলেন, যার অর্থ হলো পাথর। শিমন পিতরের পিতার নাম ছিল যোনা। তাঁর অন্য ভাইয়ের নাম ছিল আন্দ্রিয়, তিনিও যীশুর শিষ্য ছিলেন। তাঁরা পেশায় ছিলেন জেলে। জেবেদের ছেলে যাকোব ও যোহনের সাথে পিতর ও আন্দ্রিয় সমুদ্রে মাছ ধরার কাজ করতেন। যীশু পিতরের শাশুড়িকে সুস্থ করেছিলেন, এ থেকে বোঝা যায় যে, পিতর বিবাহিত ছিলেন। তবে কোথাও উল্লেখ নেই যীশুর শিষ্য হওয়ার আহ্বানের সময় তাঁর স্ত্রী জীবিত কিংবা মৃত ছিলেন।

যীশু প্রথম যাদেরকে আহ্বান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শিমন পিতর ছিলেন অন্যতম। সমুদ্রে মাছ ধরার সময় যীশু পিতরকে আকস্মিকভাবে আহ্বান করেন। যীশুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পিতর হয়ে ওঠেন শিষ্যদলের প্রধান।

শিষ্যদের যাচাই করার জন্য একবার যীশু জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি কে এই বিষয়ে, তাঁর সম্বন্ধে লোকেরা কী বলে। সেই উত্তর শোনার পর তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি কে এই বিষয়ে শিষ্যেরা নিজেরা কী বলেন। শিষ্যদের মধ্যে পিতর বলেছিলেন, "আপনি মুক্তিদাতা, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র" (মথি ১৬:১৩-২০)। শিষ্যদের মধ্যে পিতরই প্রথম যিনি যীশুকে মুক্তিদাতা মসীহ্ বলে চিনতে পেরেছিলেন এবং স্বীকার করেছিলেন। এটি কোনো সাধারণ বিষয় নয়। একটি গভীর বিশ্বাসের তত্ত্ব ধু পিতর এখানে প্রকাশ করেছেন। এর মধ্য দিয়ে পিতর পিতা ঈশ্বরের মুক্তি পরিকল্পনাকেই প্রকাশ করেছেন; যীশুর প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাসকেই স্বীকার করেছেন। এর মধ্য দিয়েই যীশুর সত্য পরিচয়কেই তিনি প্রকাশ করেছেন।

পিতরের উত্তরে যীশু খুশি হয়েছিলেন। তিনি পিতরকে ধন্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং আশীর্বাদিত করেছেন। তিনি পিতরকে পাথর বলে সম্বোধন করে তাঁর নামের যথার্থতা প্রকাশ করেছেন। পিতরকেই তিনি প্রধান হিসেবে বেছে নিয়েছেন এবং বলেছেন, "তুমি পাথর, আর এই পাথরের উপরই আমি আমার মণ্ডলী স্থাপন করব। আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবি দেবো, পৃথিবীতে যা তুমি বেঁধে রাখবে, স্বর্গেও তা বেঁধে রাখা হবে আর পৃথিবীতে যা তুমি ছেড়ে দেবে, স্বর্গেও তা ছেড়ে দেওয়াই হবে" (মথি ১৬:১৭-২০)।

পিতরের উপর দায়িত্ব অর্পণ

পিলাত ভবনে যীশুর বিচারের সময় একজন দাসীর প্রশ্নের জবাবে পিতর তিনবার যীশুকে অস্বীকার করেছিলেন। এতে পিতরের বিশ্বাস যে তখনও দুর্বল ছিল তাই প্রকাশ পেয়েছিল। পিতরের বিশ্বাসকে আরও খাঁটি করার জন্য যীশু একবার প্রশ্ন করেছিলেন, "পিতর, তুমি কি আমাকে ভালোবাস?" যীশু পিতরকে তিনবার একই প্রশ্ন করেছিলেন। আর তিনবারই এই প্রশ্নের উত্তরে পিতর বলেছিলেন, "হ্যাঁ প্রভু, আমি আপনাকে ভালোবাসি।" প্রত্যুত্তরে যীশু পিতরকে বলেছিলেন, "তুমি আমার মেষদের দেখাশোনা করো"(যোহন ২১:১৫-১৭)।

এই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে যীশু পিতরকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করেছেন যেন তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। পিতরের উপর এক বিশাল দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। যীশুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও বিশ্বাস স্বীকারের জন্যই যীশু পিতরকে এই মহান দায়িত্ব দিয়েছেন। "আমার মেষদের দেখাশুনা কর"–এটা একটা বড় দায়িত্ব যা পিতরের উপর অর্পিত হয়েছিল।

পিতর হয়ে উঠেছেন শিষ্যদলের প্রধান এবং মণ্ডলীর নেতা। পিতর ছিলেন মণ্ডলীর প্রথম পোপ। রূপক অর্থে স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি তাঁরই হাতে দেওয়া হয়েছে। পিতর যীশুর অনেক ঘটনার সাক্ষী। যেখানে সকল শিষ্য যেতে পারেননি, সেখানে পিতর ও মাত্র অন্য দুইজন শিষ্য যীশুর সাথে ছিলেন। যেমন পর্বতের উপর যীশুর দিব্য রূপান্তর এবং গেরাসনীয় অঞ্চলে সমাজ গৃহে অধ্যক্ষ সাইরাসের মৃত কন্যাকে বাঁচিয়ে তোলার সময় তিনজন শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে ছিলেন আর গেৎসিমানি বাগানে যীশুর মর্মবেদনার সময় পিতর, যাকোব ও যোহনকে যীশু সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

পিতর ছিলেন একজন সুবক্তা। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পিতরই এগিয়ে গিয়েছেন ও শিষ্যদের একজন হয়ে কথা বলেছেন। অনেক সময় যীশুর বিভিন্ন প্রশ্নে পিতরই জবাব দিয়েছেন। কয়েক ক্ষেত্রে পিতর সঠিক উত্তর দিতে পারেন নি। ফলে তাঁর বিশ্বাসের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। জলের উপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে তিনি ডুবে যাচ্ছিলেন। যীশু শিষ্যদের পা ধুয়ে দেওয়ার সময় পিতর বাধা দিয়েছিলেন। গেৎসিমানি বাগানে যীশুকে গ্রেফতার করার সময় পিতর তরবারি দিয়ে একজন সৈন্যের কান কেটে ফেলেছিলেন। মৃত্যুভয়ে সামান্য এক দাসীর কাছে পিতর যীশুকে তিনবার অস্বীকার করেছিলেন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি পিতরের বিশ্বাস দুর্বল ছিল। একবার যীশু জলের উপর দিয়ে হাঁটছিলেন। পিতর বললেন, আমাকেও অনুমতি দিন জলের উপর দিয়ে হেঁটে আপনার কাছে আসতে। যীশু তাঁকে আসতে বললেন। কিন্তু মাঝপথে গিয়ে পিতর ডুবে যেতে লাগলেন। যীশু তখন তাঁকে বললেন, "এত অল্প তোমার বিশ্বাস? কেনই বা সন্দেহ করলে তুমি?" (মথি ১৪:৩১)। বিশ্বাসের দুর্বলতায় যীশু তাঁকে গঠন দিয়েছেন। শক্তি ও সাহস দিয়েছেন যার ফলে পঞ্চাশত্তমী দিনে এই পিতরই সাহসের সাথে পুনরুত্থিত খ্রিষ্টের পক্ষে জোরালো বক্তব্য দিয়েছেন এবং ফরিসিদের অভিযুক্ত করেছেন। পিতরের বক্তব্য শুনে সেদিন তিন হাজার মানুষ দীক্ষা নিয়ে খ্রিষ্ট বিশ্বাসী হয়েছিলেন। পিতর

মণ্ডলীর প্রধান হিসেবে বিশ্বাসকে ধরে রেখেছেন এবং আমৃত্যু যীশুর কথা প্রচার করেছেন। তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করে মণ্ডলীর ভিত্তি হয়ে উঠেছেন।

কাজ : সাধু পিতর কোথায় কোথায় বাণী প্রচার করেছেন,বাইবেল থেকে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

পাঠ ৩ : পুনরুত্থানের সাক্ষী সাধু পিতর

সাধু পিতর যে শুধু মণ্ডলীর ভিত্তি হয়ে উঠেছিলেন তা নয়, তিনি পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের প্রথম সাক্ষীও। সাধু যোহন তাঁর লিখিত মঙ্গলসমাচারে বর্ণনা করেছেন, সাধু পিতর যীশুর শূন্য কবরে প্রথম প্রবেশ করেছেন (যোহন ২০:১-৯)। যদিও যীশুর প্রিয় শিষ্য যোহন শূন্য কবর পিতরের আগেই দেখেছেন তথাপি তিনি ভিতরে প্রবেশ করেননি। মণ্ডলীর প্রধান হিসাবে অগ্রগণ্য পিতরের জন্য অপেক্ষা করেছেন এবং পিতরকে আগে ভিতরে প্রবেশ করার সুযোগ দিয়েছেন।

যীশুর পুনরুত্থানের পর বেশ কয়েকবার যীশু শিষ্যদের দেখা দিয়েছেন এবং যীশুর সব দর্শনেই পিতর উপস্থিত ছিলেন। যীশু যে তাঁর পুনরুত্থানের কথা মৃত্যুর পূর্বে বলে গেছেন পিতর বুঝতে পেরেছেন, তা সত্যি হয়েছে। পিতর বিশ্বাস করেছিলেন যে যীশু সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন।

সাধু পল তাঁর বিভিন্ন পত্রে যীশুর পুনরুত্থানের কথা প্রচার করেছেন। সবখানেই তিনি প্রকাশ করেছেন যে যীশু সর্বপ্রথমে পিতরকে দেখা দিয়েছেন এবং পরে অন্যান্য শিষ্য ও আরও অনেক মানুষকে দেখা দিয়েছেন। সাধু যোহন তাঁর লিখিত মঙ্গলসমাচারের শেষ অধ্যায়ে পিতরের সাথে পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের সুন্দর একটি সংলাপ তুলে ধরেন।

পিতর যীশুকে তিনবার অস্বীকার করেছিলেন। তিনবার অস্বীকারের বিপরীতে পিতর তিনবার যীশুকে 'ভালোবাসি' বলে স্বীকার করেছেন। আর যীশু পিতরকে তিনবার স্মরণ করিয়ে দেন, "আমার মেষদের দেখাশোনা করো।" মণ্ডলীর প্রধান হিসেবে পিতরের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো যীশু পুনরায় পিতরকে স্মরণ করিয়ে দেন।

পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের আদেশ পিতর জীবন দিয়ে পালন করেছেন। তিনি মণ্ডলীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি যুদা ইস্কারিয়তের স্থানে মাথিয়াসকে বেছে নেওয়ার নির্বাচন পরিচালনা করেন। আদি খ্রীষ্টমণ্ডলীতে খ্রীষ্টভক্তদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাওয়াতে শিষ্যগণ খাবার বিতরণে অনেক সময় দিচ্ছিলেন। এদিকে তাঁদের বাণী প্রচারে বিঘ্ন ঘটছিল। তাই পিতরের নেতৃত্বে শিষ্যগণ সামাজিক কাজের জন্য সাতজন ডিকনকে বেছে নেন। বিভিন্ন ঘটনায় পিতর শিষ্যদের মুখপাত্র হয়ে বক্তব্য রাখেন। যেমন, পবিত্র আত্মার অবতরণের দিন পিতরই ইহুদি জনতার কাছে প্রথম বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। তখন তাঁর কোনো ভয়ভীতি ছিল না। কিছু কিছু বিষয় নিয়ে শিষ্যদের মাঝে দ্বন্দ্ব হলে

পিতর তা মীমাংসা করেছেন। পুনরুত্থানের কথা প্রচার করতে গিয়ে পিতর কারাবরণ করেছেন। তবে তাঁর বিশ্বাসের ফলে তিনি আশ্চর্যভাবে কারাগার থেকে মুক্ত হয়েছেন। পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের নামে সাধু পিতর অনেক আশ্চর্য কাজও করেছেন। একবার মন্দিরে প্রবেশের আগে মন্দির-দ্বারে এক খোঁড়া ভিক্ষুক পিতরের কাছে ভিক্ষা চাইল। পিতর বললেন, সোনা বা রুপা কিছুই নেই আমার, তবে আমার যা আছে, তোমাকে তা-ই দিচ্ছি। আমি নাজারেথের যীশুখ্রীষ্টের নামে বলছি, হেঁটে বেড়াও। আর তখনই খোঁড়াটি সুস্থ হয়ে গেল।

যে পিতর বিশ্বাসে দুর্বল ছিলেন, পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ পেয়ে তিনি সবল হয়ে উঠেছিলেন, পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে তিনি সাহসের সাথে বক্তব্য দিয়েছেন এবং পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের কথা প্রচার করেছেন। তাঁর প্রচারের ফলে বিশ্বাসী হয়ে তিন হাজার মানুষ সেদিন দীক্ষা নিয়েছেন। তিনি গোটা মণ্ডলীর প্রধান হিসেবে বিশ্বাস শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি সুদূর রোম পর্যন্ত তিনি প্রচার করেছেন। শেষে সাধু পিতর ক্রুশের উপর নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। গুরুর পথ অনুসরণ করে সাধু পিতর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুকে বেছে নেন এবং বিশ্বাস রক্ষা করার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন।

কাজ : পিতরের জীবনের কোন দিকগুলো তোমাকে বিশেষ অনুপ্রেরণা দান করে,তা দলে সহভাগিতা করো।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো।

১. সাধু পিতর ছিলেন ... মধ্যে প্রধান।

২. পিতরকে যীশু দৈনন্দিন ... থেকে মুক্ত করে ঈশ্বরের সেবা কাজে নিয়োজিত করলেন।

৩. পিতর ছিলেন একজন ... ।

৪. পিতরের বক্তব্য শুনে ... মানুষ দীক্ষা নিয়ে খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়েছিলেন।

৫. পিতর ছিলেন মণ্ডলীর ... পোপ।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. যীশুর মুখের কথা, চোখের দৃষ্টি	• শিষ্যদলের প্রধান
২. যীশুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পিতর হয়ে ওঠেন	• পুনরুত্থানের কথা প্রচার করেছেন
৩. পিতর মণ্ডলীর প্রধান হিসেবে	• পিতরের মন আকর্ষণ করেছিল
৪. পিতর যীশুকে	• বিশ্বাসকে ধরে রেখেছেন
৫. সাধু পল তাঁর বিভিন্ন পত্রে	• তিনবার অস্বীকার করেছিলেন
	• ভালোবাসি বলে স্বীকার করেছেন।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. যীশু তাঁর প্রচার কাজে সঙ্গী হিসেবে কয়জনকে বেছে নিয়েছিলেন?

ক. তিনজন খ. চারজন

গ. দশজন ঘ. বারোজন

২. 'নৌকাটি এবার গভীর জলে নিয়ে যাও' কথাটি দ্বারা বোঝায়–

ক. আধ্যাত্মিক আহ্বান

খ. দক্ষ জেলে হবার আহ্বান

গ. বাধ্য হবার আহ্বান

ঘ. নম্র হবার আহ্বান

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

মানিকের বাবা অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে বেশি দিন বাঁচবেন না। তাই তিনি তার চার সন্তানকে ডেকে সমস্ত সম্পত্তি ও দায়িত্ব কর্তব্য বুঝিয়ে দিলেন। বড় ছেলে মানিককে ডেকে তিনি সব ভাইদের দেখেশুনে রাখতে বললেন এবং বিপদে আপদে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে বললেন। কারণ তিনি দেখেছেন মানিকের মায়ের মৃত্যুতে শোকাহত পরিবারকে মানিক কীভাবে সান্ত্বনা দান করেছিল। কাজেই পরিবারের যেকোনো সমস্যায় মানিক এগিয়ে আসবে এ ব্যাপারে তার বাবা নিশ্চিত।

৩. মানিকের দায়িত্ব নেওয়ার ফল কী হতে পারে?

ক. সম্পর্কের উন্নতি খ. নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি

গ. মনোবল বৃদ্ধি ঘ. নৈতিকভাবে বলীয়ান

৪. পিতরের কোন গুণটি মানিকের মধ্যে ফুটে উঠেছে?

i. দায়িত্ববোধ

ii. নির্ভরশীলতা

iii. বিশ্বস্ততা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. iii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. **উদ্দীপক-১ :** প্রদীপ একজন পুরোহিত। গ্রামের লোকেরা তাঁর কথা খুবই আগ্রহের সাথে শোনে ও কাজে লাগায়। গ্রামের বিপথগামী লোকেরা পুরোহিতের কথা শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে যীশুর পথে ফিরে আসে।

উদ্দীপক-২ : সমীর একজন ব্যবসায়ী। দীর্ঘদিন ধরে কঠিন রোগে ভুগছে। অনেক ডাক্তার দেখিয়েও কোনো সুফল পায়নি। অবশেষে পুরোহিতের কাছে গিয়ে সবকিছু খুলে বলার পর পুরোহিত তাকে বললেন, 'ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখলে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।' তখন সমীর বলল, 'অনেকদিন ধরেই তো প্রার্থনা করছি, কিন্তু ফল পাচ্ছি না।'

ক. পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে শিষ্যদের উপর কী নেমে এসেছিল?

খ. সাধু পিতর কেন ক্রুশের উপর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন?

গ. সমীরের মধ্যে পিতরের চরিত্রের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে – ব্যাখ্যা করো।

ঘ. প্রদীপ ও সমীর দু'জনের মধ্যেই কি পিতরের চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে বলে তুমি মনে কর? যুক্তি সহকারে তোমার মতামত দাও।

২. জীবন একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসায় সে খুব একটা উন্নতি করতে পারছিল না। একদিন গির্জায় গিয়ে পুরোহিতের কাছে সব খুলে বলল। পুরোহিত তাকে কিছু পরামর্শ দিলেন। পুরোহিতের পরামর্শ অনুসারে কাজ করে সে ভালো ফলাফল পেল। এরপর থেকে সে নিয়মিত গির্জায় যেত, প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করত। বিভিন্ন ধর্মীয় কাজে এগিয়ে আসত, সাহায্য সহযোগিতা করত। তার এরূপ আচরণ দেখে পুরোহিত তাকে যীশুর কথা প্রচার করতে আহ্বান করলেন। জীবন পুরোহিতের আহ্বানে সাড়া দিলো।

ক. শিমন পিতরের পিতার নাম কী ছিল?

খ. প্রেরিতশিষ্য বলতে কী বুঝ?

গ. জীবনের মধ্যে যীশুর কোন শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২০২৫

ঘ. 'জীবন যেন পিতরেরই প্রতিচ্ছবি'– বক্তব্যটি মূল্যায়ন করো।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রেরিতশিষ্য বলতে কী বুঝ?

২. পিতর কীভাবে আশ্চর্য কাজ করতেন?

৩. পিতর কীভাবে পুনরুত্থিত খ্রিষ্টের কথা প্রচার করেছেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যীশুর আহ্বানে পিতরের সাড়াদানের ঘটনাটি বর্ণনা করো।

২. পিতরের ধর্মভাষণ ও তার ফলাফল বর্ণনা করো।

৩. 'পুনরুত্থানের সাক্ষী সাধু পিতর'–কথাটি বিশ্লেষণ করো।

সপ্তম অধ্যায়

যীশুর আশ্চর্য কাজ ও ঐশরাজ্য

প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজ সম্পর্কে আমরা জানি। আমরা আরও জানি, যীশুখ্রীষ্ট তাঁর আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে এই জগতে ঐশরাজ্যের উপস্থিতি প্রকাশ করেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা ঐশরাজ্য সম্পর্কে আরও একটু গভীর জ্ঞান লাভ করব এবং ঐশরাজ্য বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করব।

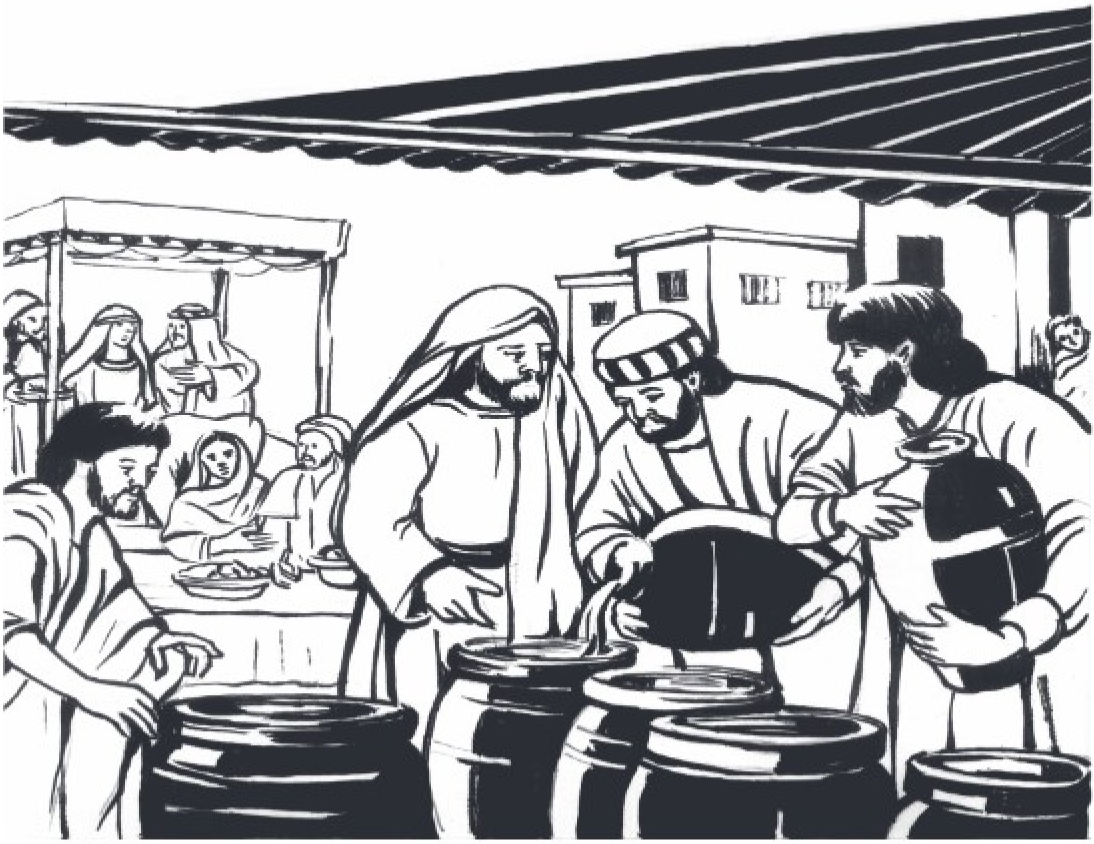

কানা নগরে বিয়েবাড়িতে যীশুর প্রথম আশ্চর্য কাজ

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- ঐশরাজ্যের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- যীশুর উপমা কাহিনি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- মথি ৮ম ও ৯ম অধ্যায়ে বর্ণিত আশ্চর্য কাজগুলোর মাধ্যমে ঐশরাজ্য বিস্তারে সক্রিয় হওয়ার জন্য যীশু লোকদের আহ্বান করেন, এ বিষয়ে বর্ণনা করতে পারব;
- ঐশরাজ্য বিস্তারে যীশুর ডাকে সাড়া দেবো।

পাঠ ১ : ঐশরাজ্য

আমরা বিভিন্ন রাজা ও রানির অনেক গল্প শুনেছি ও বই পুস্তকের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন ও রাজ্য সম্পর্কে জেনেছি। যেকোনো রাজারই একটি নির্দিষ্ট রাজ্য বা ভূখণ্ড এবং প্রজা, মন্ত্রীবর্গ ও সৈন্যসামন্ত থাকে। রাজা সব সময় তার রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য কাজ করেন এবং পাশাপাশি প্রজারা কীভাবে সুখশান্তি ও আনন্দে বসবাস করতে পারে সেই ব্যবস্থা করেন। গোটা রাজ্যের শাসন ক্ষমতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকে রাজার উপর। অন্যদিকে রাজ্যকে সুন্দর ও উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রজা সাধারণের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে।

যীশুখ্রীষ্ট এই জগতে এসেছেন এমন একটি সুন্দর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে যেখানে থাকবে ন্যায্যতা, শান্তি, আনন্দ, ভালোবাসা, ক্ষমা, সহভাগিতা এবং এরকম আরও বিশেষ বিশেষ গুণ। ঈশ্বর সকল মানুষকে ভালোবাসেন। তাই তিনি তাঁর পুত্র যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে এই জগতে সেই প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। যীশুখ্রীষ্ট এই জগতে এসেছেন পিতার ইচ্ছা পালন করতে। তিনি চেয়েছেন, তাঁর সেবার জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়ে ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে।

জাগতিক রাজ্য ও ঐশরাজ্যের মধ্যে পার্থক্য

প্রথমে আমরা জাগতিক রাজ্যের কিছু বৈশিষ্ট্য এবং পরে ঐশরাজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখব। দুই ধরনের রাজ্যের মধ্যে আমরা একটা তুলনামূলক আলোচনা করতে পারব।

জাগতিক রাজ্য

জাগতিক রাজ্য বলতে আমরা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে বুঝে থাকি। এই ভূখণ্ডের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সমস্ত কিছু এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। জাগতিক রাজ্যের মধ্যে ন্যায্যতা, শান্তি, আনন্দ, ভালোবাসা ইত্যাদি গুণগুলো রয়েছে। তবে এগুলোর পাশাপাশি রয়েছে ক্ষমতার দাপট, লোভ, লালসা, হিংসা, বিদ্বেষ, বিভেদ ইত্যাদি নেতিবাচক দিকসমূহ। ভালো ও মন্দ নিয়েই আমাদের এই জগতের রাজ্য বা জাগতিক রাজ্য।

ঐশরাজ্য

ঐশরাজ্য হলো ঈশ্বরের রাজ্য। ঈশ্বর মানুষের জন্য যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, সেটি হলো ঐশরাজ্য। ঈশ্বর এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রভু যীশুর মধ্য দিয়ে। ঐশরাজ্য এই জগতের রাজ্যের মতো সীমানা দিয়ে পরিবেষ্টিত কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নয়। এটি হলো ভালোবাসা, আনন্দ, ন্যায্যতা, শান্তি, ক্ষমা, সহভাগিতা ও সহযোগিতার রাজ্য। প্রভু যীশুখ্রীষ্ট তাঁর প্রচার কাজ শুরু করেছেন এই বলে যে, ঐশরাজ্য খুব কাছে এসে গেছে। তাই তিনি সকলকে মন পরিবর্তন ও মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস করতে আহ্বান করেছেন। যীশুখ্রীষ্ট নিজেই ঐশরাজ্যের মূর্তপ্রতীকস্বরূপ। যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই

ঐশরাজ্যের পূর্ণ প্রকাশ। প্রভু যীশু তাঁর বাণীর মধ্য দিয়ে আমাদের মাঝে ঐশরাজ্যে প্রবেশের পথ দেখিয়ে গেছেন। তিনি যে শুধু বাণীর মধ্য দিয়ে পথ নির্দেশ দিয়েছেন তা নয়, তিনি নিজেই সেভাবে জীবনযাপন করেছেন এবং আমাদেরকে সেইরূপ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

কাজ : কে কীভাবে ঐশরাজ্যের জন্য কাজ করতে পার তা দু'জন দু'জন করে আলোচনা কর।

পাঠ ২ : যীশুর উপমা কাহিনি

কোনো কোনো বিষয় রয়েছে যা ভাষায় পুরোপুরিভাবে প্রকাশ করা যায় না। আর তখনই উপমা বা রূপকের ব্যবহার করা হয়। যেমন, পৃথিবীর আকার বর্ণনা দিয়ে সম্পূর্ণ বোঝানো যায় না বলে রূপকের মাধ্যমে বলা হয় যে, পৃথিবীটা কমলালেবুর মতো গোল। স্বর্গীয় পিতার অসীম ক্ষমাশীলতা বোঝাবার জন্য যীশু হারানো ছেলের উপমা দিয়েছেন। উপমা বা রূপক ব্যবহারে যদিও ঐ বিষয়টির পরোপুরিভাবে বুঝানো সম্ভব হয় না তথাপি ঐ বিষয়বস্তুর খুব কাছাকাছি যাওয়া বা ধারণা দেওয়া সম্ভব হয়।

ঐশরাজ্যে প্রবেশ করার জন্য যীশুখ্রীষ্টের আমন্ত্রণ আসে উপমা বা রূপকের মধ্য দিয়ে, যা তাঁর শিক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য। সেই কারণে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট তাঁর প্রচার কাজে ঐশরাজ্যকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করার জন্য বিভিন্ন রূপক বা উপমা ব্যবহার করেন। উপমার মধ্য দিয়ে লোকদের ঐশরাজ্যের ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করলেও পাশাপাশি একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত নিতেও আহ্বান করেন। ঐশরাজ্যে প্রবেশ করতে হলে জাগতিক বিষয়সম্পদ, আত্মীয়স্বজন, ভোগবিলাসিতা ইত্যাদি সবকিছুর প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ করতে হবে।

বিভিন্ন রূপক বা উপমা কাহিনি

যীশুখ্রীষ্টের ব্যবহৃত রূপক বা উপমা কাহিনিগুলো আমাদের জন্য দর্পণ বা আয়নার মতো। এগুলো আমাদের জীবনের কথা বলে। প্রভু যীশু ঐশরাজ্যের মর্মসত্য প্রকাশ করার জন্য অনেক উপমা বা রূপক ব্যবহার করেছেন।

শ্যামা ঘাস ও গমের দানার উপমা

তিনি ঐশরাজ্যকে জমিতে বোনা গমের গাছ ও শ্যামা ঘাসের সাথে তুলনা করেছেন। একজন চাষি জমিতে গমের দানা বুনেছে। কিন্তু সকলে যখন ঘুমাচ্ছিল তখন শত্রু এসে গমের ক্ষেতে শ্যামা ঘাসের বীজ বুনে দিয়েছিল। গমের গাছ ও শ্যামা ঘাস দেখতে একই রকম হওয়ায় দুই-ই এক সাথে বাড়তে লাগল। যখন গমের শিষ বের হতে শুরু করল তখন শ্যামা ঘাসগুলো ধরা পড়ল। তাই কর্মচারীরা এসে মনিবকে এই বিষয়ে জানাল। তারা শ্যামা ঘাসগুলো তুলে ফেলার অনুমতি চাইল। কিন্তু মনিব অনুমতি দিলেন না। তিনি দুটোকেই একসাথে বাড়তে দিতে বললেন।

কারণ মনিবের ভয় ছিল যদি কর্মচারীরা শ্যামা ঘাস তুলতে গিয়ে গমের গাছগুলোও তুলে ফেলে, তাহলে গমের ক্ষতি হবে। ফসল কাটার সময় পর্যন্ত তিনি তাদের অপেক্ষা করতে বললেন। ফসল কাটার সময় এলে তিনি ফসল কাটিয়েদের বলে দিলেন আগে শ্যামা ঘাসগুলো তুলে এনে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে ও পরে গম তুলে এনে গোলাঘরে সঞ্চয় করতে।

শর্ষে বীজের রূপক

স্বর্গরাজ্য বা ঐশরাজ্য বোঝাতে প্রভু যীশু শর্ষে বীজের উপমা ব্যবহার করেছেন। একজন চাষি তা একদিন নিজের জমিতে বুনে দিলো। বীজ হিসাবে শর্ষে বীজ অন্যান্য বীজের চেয়ে ছোট। কিন্তু তার চারাটি অন্যান্য গুল্মের চেয়ে বড়ই হয়। আর শেষে তা হয়ে ওঠে একটি পরিণত গাছ। আকাশের পাখিরাও তাতে বাসা বাঁধতে পারে।

খামিরের উপমা

যীশু ঐশরাজ্যের বিস্তার ও বৃদ্ধি বোঝাতে খামিরের উপমা ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন, ঐশরাজ্য যেন সেই খামিরেরই মতো। একজন স্ত্রীলোক তা নিয়ে এসে তিন পাল্লা ময়দার সাথে মাখতে লাগল, যতক্ষণ না সমস্তটাই গেঁজে ওঠে।

গুপ্তধন ও মণিমুক্তার উপমা

যীশু বললেন, ঐশরাজ্য যেন কোনো জমিতে লুকিয়ে রাখা গুপ্তধনের মতো। একটি লোক তা খুঁজে পেয়ে সেখানেই আবার তা লুকিয়ে রাখল। তারপর মনের আনন্দে গিয়ে তার যা কিছু ছিল সমস্তই বেচে দিয়ে সেই জমিটা কিনে ফেলল।

আবার স্বর্গরাজ্য যেন দামি মুক্তারই মতো। একজন বণিক দামি মুক্তার খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেই বণিক একটি মহামূল্যবান মুক্তার খোঁজ পেতে না পেতেই সোজা গিয়ে তার যা-কিছু ছিল সমস্তই বেচে দিয়ে মুক্তাটি কিনে ফেলল।

জালভর্তি মাছের উপমা

প্রভু যীশু ঐশরাজ্যের তুলনা দিয়েছেন একটি জালের সাথে। একটি জাল সমুদ্রে ফেলা হলো এবং তাতে সব ধরনের মাছ ধরা পড়ল। জালটি ভর্তি হলে জেলেরা তা ডাঙায় টেনে তুলল আর সেখানে ভালো ভালো মাছগুলো বেছে ঝুড়িতে রাখল আর বাজে মাছগুলো সমুদ্রে ফেলে দিলো।

কাজ : বাস্তব জগতে ঐশরাজ্যের কী কী চিহ্ন দেখা যায় দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তার একটা তালিকা তৈরি করে তা শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করো।

২০২৫

পাঠ ৩ : ঐশরাজ্যের কর্মী

প্রতিটি সক্ষম মানুষেরই কোনো না কোনো কাজ করে জীবনধারণ করতে হয়। যেমন সাধু পল বলেন, সবাই যেন শান্ত স্থির হয়ে নিজেদের কাজকর্ম করে আর এইভাবে নিজেদের অন্নসংস্থান নিজেরাই করে নেয় (২ থেসা ৩:১২)। প্রভু যীশু শিষ্যদেরকে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে বলেন, "যে কর্মী, তার মজুরি পাবার অধিকার তো আছেই" (লুক ১০:৭)। কাজেই যে কাজ করে, সেই কর্মী। এই হিসাবে আমরা যারা নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করি, তারা সকলেই কর্মী। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য দিয়ে। সেই কারণে একেক জন মানুষ একেক কাজ করে জীবিকা উপার্জন করে। আমরা কোনো কোনো কাজ এই জগতে জীবনধারণের জন্য করি আবার কোনো কোনো কাজ পরজগতের জন্য করি। কোনোটি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে করি আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে ঐশরাজ্য বিস্তারের জন্য করি।

ঐশরাজ্য বিস্তারের জন্য মণ্ডলীতে কর্মীর বড়ই অভাব। চারিদিকে লোকের ভিড় দেখে তাদের জন্য যীশুর দুঃখ হলো। তারা ক্লিষ্ট অবসন্ন, যেন পালকবিহীন মেষের মতো। তাদের দেখে তাঁর করুণা হলো। তিনি তাদের বললেন, "ফসল তো প্রচুর, কিন্তু কাজ করার লোক অল্পই। তাই ফসলের মালিককে মিনতি জানাও যেন তাঁর শস্যক্ষেতে কাজ করার লোক পাঠিয়ে দেন" (মথি ৯:৩৭)।

কিন্তু ঐশরাজ্যে কাজ করার জন্য যীশুর আবেদন ভিন্নতর। সবাই এই কাজের জন্য আহূত। কিন্তু মনোনীত হয় অল্পই। একবার একজন শাস্ত্রী কাছে এসে যীশুকে বলল, গুরু, আপনি যেখানেই যাবেন, আমি কিন্তু সেখানেই আপনার সঙ্গে যাব। যীশু তার কথার উত্তরে বললেন, শেয়ালের থাকবার গর্ত আছে, আকাশের পাখিরও বাসা আছে, কিন্তু মানবপুত্রের মাথা গোঁজবার জায়গাটুকু নেই" (মথি ৮:২০)। আবার অন্য একজন যীশুর কাছে এসে বলল, প্রভু অনুমতি দিন আমি আগে আমার বাবাকে সমাধি দিয়ে আসি। কিন্তু যীশু তাকে বললেন, "না, তুমি বরং আমার সঙ্গেই চল। মৃতদের সমাধি দেওয়ার কাজটা মৃতদের হাতেই ছেড়ে দাও" (মথি ৮:২১)।

যীশু করগ্রাহক মথিকে তাঁর পথ অনুসরণ করার কথা বলার সাথে সাথে মথি শুল্কদপ্তর ছেড়ে যীশুর সঙ্গে চলেছেন। যীশু মথির বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়েছেন। তা দেখে ফরিসিরা ও শাস্ত্রীরা শিষ্যদের কাছে যীশুর সম্বন্ধে বলাবলি করতে লাগল। যীশু তাদের প্রত্যুত্তরে বললেন,"সুস্থতু সবল যারা তাদের তো চিকিৎসকের কোনো প্রয়োজন হয় না: প্রয়োজন হয় তাদেরই ব্যাধিগ্রস্ত যারা আসলে, আমি তো ধার্মিকদের নয়, পাপীদের আহ্বান জানাতে এসেছি" (মথি ৯: ১২-১৩)। কাজেই দেখা যায়, ঐশরাজ্যের কর্মী হওয়ার জন্য সকল মানুষ সমানভাবে আহূত ও মনোনীত। তবে যারা নিজেদেরকে ইতিমধ্যেই পবিত্র বলে মনে করে, ঐশরাজ্যে প্রবেশের মতো নম্রতা তাদের নেই।

কাজ : তুমি কীভাবে ঐশরাজ্য বিস্তারের জন্য যীশুর আহ্বান শুনতে পাও তা ব্যক্তিগতভাবে ধ্যান করে খাতায় লেখো।

পাঠ ৪ : যীশুর আহ্বানে সাড়া দেওয়া

আহ্বান অর্থ হলো ডাক। মানুষ মানুষকে শনাক্ত করার জন্য নাম রাখে। ঈশ্বর মানুষকে সেই নাম ধরেই ডাকেন। এক মানুষ আর এক মানুষকে ডাক দেয় তার দিকে মনোনিবেশ বা দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য। আমরা কারও ডাক শুনে তার দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। শুধু তাই নয় আমরা তার ডাকে সাড়া দিতেও চেষ্টা করি।

যীশুখ্রীষ্ট তাঁর বাণী প্রচারের শুরুতে বারোজনের একটি দল গঠন করলেন। এই বারোজনের নাম তিনি দিলেন প্রেরিতদূত। প্রেরিতদূত কথাটির অর্থ হলো সেই দূত যাকে প্রেরণ করা হয়েছে। যীশু তাঁদের বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছেন। আবার অনেকে তাঁর বাণী শুনে তাঁর অনুগামী হয়েছেন।

যীশুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রথম শিষ্যরা তাঁদের সবকিছু ফেলে রেখে যীশুর অনুসরণ করেছেন। পিতর, যাকোব, যোহন ও আন্দ্রিয়, যারা পেশায় জেলে ছিলেন, তাঁরা তাঁদের একমাত্র সম্বল নৌকা, জাল, সঙ্গীদের ও তাঁদের পিতা-মাতাদের রেখে যীশুর পিছু নিয়েছেন। করগ্রাহক মথি তাঁর এত দিনের পেশা, কর আদায় ছেড়ে দিয়ে যীশুকে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর বাড়িতে তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছেন। শুধু যে বারোজন শিষ্যই যীশুকে অনুসরণ করেছিলেন, তা নয়। তাঁর বাণী শোনার জন্য লোকেরা দলে দলে তাঁর সাথে যোগ দিয়েছে।

বারোজন প্রেরিত দূতকে মনোনয়ন

যীশু সারা রাত ধরে প্রার্থনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন সব শিষ্যদের মধ্য থেকে বিশেষ কয়েকজনকে মনোনয়ন দিতে। এরপর তিনি তাঁদের বেছে নিলেন। যে বারোজনকে তিনি বেছে নিলেন তাঁদের তিনি তাঁর কাছে ডাকলেন। তাদেরকে তিনি রোগব্যাধি সারিয়ে তোলার ও অপবিত্র যত বিদেহী আত্মাকে তাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা দিলেন। তাঁরা হলেন—সিমোন, যাঁকে পিতরও বলা হয়, আর তাঁর ভাই আন্দ্রিয়, জেবেদের ছেলে যাকোব আর যাকোবের ভাই যোহন, ফিলিপ আর বার্থলোমিয়, টমাস আর করগ্রাহক মথি, আলফেয়ের ছেলে যাকোব আর থাদ্দেয়, উগ্রধর্মা সিমোন আর যুদা ইস্কারিয়োৎ, যিনি পরে যীশুকে শত্রুদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

আমাদের আহ্বান

প্রথম শিষ্যদের ন্যায় প্রভু যীশু প্রতিনিয়ত আমাদের আহ্বান করছেন। প্রথম শিষ্যদের ন্যায় আমাদের সবাইকেই সবকিছু ছেড়ে তাঁর অনুসরণ করতে হবে না। তিনি এই সময় আমাদের আহ্বান করেন তাঁর বাণী অনুসারে জীবনযাপন করতে, তাঁর দেখানো পথে চলতে। তবে তাঁর নির্দেশ অনুসারে জীবনযাপন করা সহজ নয়। তাই তিনি বলেছেন—"কেউ আমাকে অনুসরণ করতে চাইলে তাকে আত্মত্যাগ করতে হবে এবং নিজের ক্রুশ বহন করে চলতে হবে।" তিনি আরও বলেছেন—"কেউ যদি আমার চেয়ে তার পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনদের বেশি ভালোবাসে সে আমার শিষ্য হওয়ার যোগ্য নয়।"

কাজ : তুমি কীভাবে তোমার ব্যক্তিগত আহ্বান উপলব্ধি করে যীশুকে অনুসরণ করবে তা লেখো।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো

১. যীশু সেবার জীবন ও তাঁর বাণীর মধ্য দিয়ে ... ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন।

২. ঐশরাজ্য হলো ... রাজ্য।

৩. যীশুখ্রীষ্টের ব্যবহৃত রূপক বা উপমাগুলো আমাদের জন্য ...।

৪. ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন ... দিয়ে।

৫. প্রেরিত দূত কথাটির অর্থ হলো যাকে ... করা হয়েছে।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো

বাম পাশ	ডান পাশ
১. আহ্বান অর্থ	• মথির বাড়িতে
২. ঐশরাজ্যে প্রবেশের জন্য	• দিয়েছিলেন যুদা
৩. ভালো ও মন্দ নিয়েই	• নম্রতা প্রয়োজন
৪. যীশুকে শত্রুদের হাতে তুলে	• ঐশরাজ্য
৫. যীশু নিমন্ত্রণ খেয়েছেন	• ডাক
	• জাগতিক রাজ্য

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শ্যামা ঘাস কীসের প্রতীক?

ক. মন্দতার খ. দুর্বলতার

গ. অশান্তির ঘ. বিচ্ছেদের

২. কীভাবে ঐশরাজ্যে প্রবেশ করা যায়?

ক. জাগতিক সম্পদ গ্রহণ করে খ. আত্মীয়-স্বজনকে সম্মান করে

গ. ভোগ-বিলাসিতা বিসর্জন দিয়ে ঘ. সঞ্চয় করার মাধ্যমে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী সুমনা ও মোহনা খুব ভালো বন্ধু। দুজনেই পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং অন্যদেরকে সহযোগিতা করে। কিন্তু তাদের শ্রেণির রিনা তাদের খুব বিরক্ত করে, খারাপ কথা বলে, অশালীন পোশাক পরে অন্যদেরকে উৎসাহিত করে। শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীরাও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শ্রেণিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। সকলে মিলে রিনাকে বের করে দেওয়ার কথা বললে প্রধান শিক্ষক বললেন, 'ফলাফল দেওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

৩. প্রধান শিক্ষকের আচরণে কোন উপমার শিক্ষা প্রকাশ পায়?

ক. জালভর্তি মাছের খ. শর্ষের

গ. শ্যামা ঘাসের ঘ. খামিরের

৪. উপমার আলোকে প্রধান শিক্ষকের উক্তিটির মর্মার্থ হলো−

ক. শেষ বিচারের সময় খ. বৎসরের শেষ সময়

গ. ফলাফল দেওয়ার সময় ঘ. আগমনের সময়

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বিজয় ও তার বন্ধুরা মিলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চাঁদা আদায় করত। এভাবে সে বাড়িতে অনেক সম্পদ গড়ে তোলে। একজন যাজক তার বাড়িতে এসে বললেন, 'এসব ছেড়ে আমার সঙ্গে চল। তুমি ঈশ্বরের পক্ষে কাজ করবে।' বিজয়ের এতদিনের কাজ, চাঁদা আদায় সব ছেড়ে দিয়ে সে যাজকের সঙ্গে কাজ করে। পরে বিজয় তার সম্পত্তি থেকে গরিবদের টাকা বিতরণ করে। যাজক নিজ বাড়িতে তাকে নিমন্ত্রণ জানান। পরবর্তীতে সে দীন দরিদ্র, গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বাণী প্রচার ও সেবামূলক কাজ করে।

২০২৫

ক. যারা যীশুর বাণী শোনে ও পালন করে তারা কেমন মানুষ?

খ. ঐশরাজ্য বলতে কী বোঝায়—ব্যাখ্যা করো।

গ. বিজয়ের কাজের মধ্যে করগ্রাহক মথির চরিত্রের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে— ব্যাখ্যা করো।

ঘ. বিজয়ের ও মথির কাজের তুলনামূলক আলোচনা করো।

২. অণুর কাকা বড় লোক, তাই তিনি অনু ও তার পরিবারের লোকদের ঘৃনা করতেন। কাকাতো ভাইয়েরা জমি নিয়ে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া, মারামারি করত। এসব দেখে অণু চিন্তা করত, মানুষ কেন এ কাজগুলো করে? অণু দেখেছে তাদের গ্রামের চেয়ারম্যান খুব দাপটের সঙ্গে চলতেন, অন্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করতেন এবং গরিবদের উপর অত্যাচার করতেন। এ অন্যায়গুলো অণুকে খুব কষ্ট দিত। অণু ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল এবং সে তার সামর্থ্য অনুযায়ী দুস্থদের জন্য জমি কিনে ঘর তুলে দেয়, অসুস্থ লোকদের চিকিৎসার জন্য সেবাকেন্দ্র চালু করে। এভাবে অণু প্রত্যেককে ভালো পথে চলার অনুপ্রেরণা দেয়।

ক. যীশু কার বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়েছিলেন?

খ. আমাদের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান গুরুত্বপূর্ণ কেন?

গ. অণুর গ্রামের চেয়ারম্যানের মধ্যে কোন রাজ্যের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে—পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. অণু ও চেয়ারম্যানের মধ্যে ঐশরাজ্য ও জাগতিক রাজ্যের বিষয়গুলো লক্ষণীয়—পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তোমার মতামত দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ঐশরাজ্য বলতে কী বোঝায়?

২. যীশুর আহ্বানে সাড়া দিতে হলে আমাদের কী করতে হবে?

৩. জালভর্তি মাছের উপমার অন্তর্নিহিত অর্থ লেখো?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ঐশরাজ্য ও জাগতিক রাজ্যের তুলনামূলক আলোচনা করো।

২. ঐশরাজ্য বিস্তারের জন্য আমরা কীভাবে কাজ করব?

৩. শ্যামা ঘাস ও গমের দানার উপমা কাহিনিটি অর্থসহ নিজের ভাষায় লেখো। ২০২৫

অষ্টম অধ্যায়

খ্রীষ্টমণ্ডলী

আমরা জানি যে, খ্রীষ্টমণ্ডলী হলো খ্রীষ্টের দ্বারা স্থাপিত মণ্ডলী। খ্রীষ্টকে কেন্দ্র করে খ্রীষ্টবিশ্বাসী ভক্তগণ একত্রে ভালোবাসার মিলন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করে। খ্রীষ্টমণ্ডলী হলো খ্রিষ্টের সাথে মানুষের অন্তরঙ্গভাবে মিলনের প্রকাশ। এই অধ্যায়ে খ্রীষ্টের সাথে খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিরাজমান ঘনিষ্ঠ বা অন্তরঙ্গ সম্পর্কটি সম্পর্কে জানব। এ বিষয়ে জানার জন্য আমরা মানবদেহের মস্তক ও অন্যান্য অংশের তুলনার মাধ্যমে খ্রীষ্টের মস্তকের সাথে দেহের সম্পর্ক জানার চেষ্টা করব। আমরা কীভাবে এই মণ্ডলীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে উঠতে পারি তা নিয়েও আমরা আলোচনা করব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- খ্রীষ্টের দেহরূপ মণ্ডলীর বর্ণনা দিতে পারব;
- খ্রীষ্টমণ্ডলীর মস্তক হিসাবে খ্রীষ্টের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- খ্রীষ্টদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হিসাবে খ্রীষ্টভক্তদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- মণ্ডলীর অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হব।

পাঠ ১ : খ্রীষ্টমণ্ডলী একটি দেহ

আমাদের নিজ নিজ দেহ সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকেরই কম ও বেশি জ্ঞান আছে। মানুষ হিসাবে আমাদের দেহ একটি। ঈশ্বর কত সুন্দর করেই না আমাদের এই দেহকে সৃষ্টি করেছেন! যে অংশটি যেখানে থাকার কথা তা তিনি সেখানে সুন্দর করে স্থাপন করে দিয়েছেন। আমাদের এই দেহ একটি, কিন্তু এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক। সব অঙ্গই দেহের সাথে যুক্ত রয়েছে।

কাজ : খ্রীষ্টমণ্ডলীকে বোঝানোর জন্য সবাই নিজ নিজ খাতায় একটি মানবদেহের ছবি অঙ্কন কর। তুমি মণ্ডলীর কোন অঙ্গটি হতে চাও এবং তা হয়ে কী কাজ করতে চাও তা লেখো।

খ্রীষ্টের দেহ

খ্রীষ্টমণ্ডলী খ্রীষ্টেরই দেহ। যারা প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর সাথে সংযুক্ত হয় তারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবেই তাঁর সাথে মিলিত হয়। যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাদের দেহ-মন-আত্মায় খ্রীষ্টের জীবন সঞ্চারিত হয়। পবিত্র সংস্কারগুলোর দ্বারা খ্রীষ্টের যাতনাভোগ এবং মহিমার সঙ্গে খ্রীষ্টমণ্ডলীর অদৃশ্য অথচ বাস্তব সংযোগ ঘটে। দীক্ষাস্নান সংস্কারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টমণ্ডলী খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সহভাগী হয়। পবিত্র খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টমণ্ডলী খ্রীষ্টের দেহকে বাস্তবে

গ্রহণ করে। এর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টমণ্ডলী খ্রীষ্টের সাথে ও একে অপরের সাথে মিলন বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যীশু বলেছেন, যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বাস করে আর আমি তার অন্তরে বাস করি।

দেহরূপ খ্রীষ্টের সাথে খ্রীষ্টমণ্ডলীর এই একতা ভক্তদের অন্তরে ভ্রাতৃপ্রেম সৃষ্টি করে এবং এই প্রেমের বা একতার বন্ধনে জীবনযাপন করতে সবাইকে উদ্দীপিত করে। সাধু পল এই একতাকে মানবদেহের সাথে তুলনা করে বলেছেন আমাদের দেহ এক অথচ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক এবং দেহের অঙ্গগুলো অনেক হয়েও সব কটি মিলে এক দেহই হয়। তেমনি আমরা একই পবিত্র আত্মার শক্তিতে সকলেই দীক্ষাস্নাত হয়ে একই দেহের অঙ্গ হয়ে উঠেছি। তাই আমাদের উৎস এক। আমরা খ্রীষ্টের মধ্যে এক। সেই কারণে তিনি বলেছেন, "আমি যেমন তোমাদের অন্তরে রয়েছি, তেমনি তোমরা আমাতে থাক। আমি হলাম দ্রাক্ষালতা, তোমরা হলে শাখাপ্রশাখা" (যোহন ১৫:৪-৫)।

কাজ : মাথা দিয়ে আমরা যে সব কাজ করি দলে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো ও পরে প্রত্যেক দল থেকে একজন প্রতিবেদন পেশ করো। প্রতিবেদন থেকে যে কাজের নামগুলো উঠে আসবে সেগুলো একটি পোস্টারে লিখে ঝুলিয়ে রাখো।

পাঠ ২ : দেহের মস্তক খ্রীষ্ট

সব কিছুর মধ্যে একটি প্রধান বা প্রথম অংশ থাকে। তা সংখ্যার দিক থেকে হতে পারে। আবার গুরুত্ব বা ভূমিকার দিক থেকেও হতে পারে। একটি পরিবারের প্রধান বা কর্তা হলেন পিতা বা মাতা। পরিবারের প্রধান বা মস্তক হিসাবে তাঁর ভূমিকা অনেক। মানবদেহের প্রধান অংশ হলো মস্তক। মাথা মানবদেহের জন্য কত কাজ যে করে থাকে তা বলে শেষ করা যাবে না।

মণ্ডলীর মস্তক খ্রীষ্ট

যীশুখ্রীষ্ট হলেন মণ্ডলীর মস্তকস্বরূপ। পিতার সাথে সংযুক্ত থেকে পিতার গৌরবে তিনি সবকিছুর শীর্ষে রয়েছেন। খ্রীষ্ট তাঁর নিস্তার রহস্যে আমাদেরকে একত্রিত করেন। এই কারণে আমরা তাঁর জীবন রহস্যে প্রবেশ করি। মস্তকরূপ খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত থাকার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর কষ্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। আমরা তাঁর কষ্টের সহভাগী হয়েছি যেন তাঁর গৌরবেও গৌরবান্বিত হতে পারি।

খ্রিষ্ট হলেন মণ্ডলীর মস্তক

মস্তকরূপ খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত থাকার মধ্য দিয়ে আমরা বৃদ্ধি লাভ করি। সেই কারণে তিনি তাঁর দেহরূপ মণ্ডলীকে বিভিন্ন দান ও সহায়তা দিয়ে থাকেন। তাঁর সহায়তা লাভের মধ্য দিয়ে আমরা পরিত্রাণ লাভের পথে এগিয়ে যাই। একে অন্যের সাহায্য করে থাকি। এভাবে মস্তকরূপ খ্রীষ্ট ও দেহরূপ মণ্ডলী মিলে গড়ে তোলে পরিপূর্ণ খ্রীষ্টকে।

কাজ : দলীয় আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসা মস্তকের কাজগুলোর সাথে মণ্ডলীর মস্তক খ্রীষ্টের একটি সম্পর্ক দেখাও।

পাঠ ৩ : দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

মানবদেহে অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে। প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ ভিন্ন ভিন্ন। সাধু পল বলেন আমাদের দেহ কেবলমাত্র একটি অঙ্গ নিয়ে নয়। দেহের মধ্যে অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে। মানবদেহের এই বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর কাজও বিভিন্ন রকম। ঈশ্বর সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে এক জায়গায় বসিয়ে দেন নি। তাঁর পছন্দমতো অঙ্গগুলোকে বিভিন্ন উপযুক্ত ও ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেক অঙ্গের গুরুত্বের দিক দিয়েও একটি থেকে অন্যটি কম নয়। একটি অঙ্গ অন্য অঙ্গকে বলতে পারে না তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া একটি অঙ্গ ব্যথা পেলে সবাই কষ্ট ভোগ করে। অন্যদিকে একটি অঙ্গ যদি সমাদর বা আনন্দ পায় তাহলে অন্যগুলোও আনন্দে আনন্দিত হয়।

কাজ : দেহের চোখ, কান, নাক, মুখ, হাত, পা ইত্যাদি দিয়ে আমরা কী কী কাজ করি দলে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো ও পরে প্রত্যেক দল থেকে একজন করে তার প্রতিবেদন পেশ করো। প্রতিবেদন থেকে যে কাজের নামগুলো উঠে আসবে, সেগুলো একটা পোস্টারে লিখে শ্রেণিকক্ষে ঝুলিয়ে রাখো।

মণ্ডলীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

মানবদেহের মতো খ্রীষ্টমণ্ডলী একটি দেহ এবং দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায় প্রত্যেক খ্রীষ্টভক্ত এক একটি অঙ্গ। সাধু পল বলেন, পরমেশ্বর মণ্ডলীতে যাদের বিশেষ পদে বসিয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রথমে আছেন প্রেরিতদূতেরা, তারপর প্রবক্তারা, তারপর শিক্ষাগুরুরা; তারপর রয়েছেন তারাই–যাদের তিনি দিয়েছেন অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা বা রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা কিংবা পরকে সাহায্য করার বিশেষ গুণ বা তাদের পরিচালনা করার বিশেষ ক্ষমতা অথবা নানা অজ্ঞাত ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা, অন্য কাউকে আবার সেই ভাষা বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা। সুতরাং দেখা যায়, ঈশ্বর মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন দান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি চান মানুষ যেন তাদের দানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে ও দান অনুসারে কাজ করে। যাকে ঈশ্বর যে দান দিয়েছেন বা যাকে যে কাজের জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন সেই কাজ প্রত্যেকেরই সুন্দরভাবে করতে হবে।

কাজ : দলীয় আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসা চোখ, কান, নাক, মুখ, হাত, পা ইত্যাদির কাজগুলোর সাথে মণ্ডলীর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্পর্ক দেখাও।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো

১. খ্রীষ্টমণ্ডলী হলো খ্রীষ্টের সাথে মানুষের ... মিলনের প্রকাশ।

২. আমাদের দেহ একটি কিন্তু এর ... অনেক।

৩. দীক্ষাস্নান সংস্কারের মধ্য দিয়ে ... খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সহভাগী হয়।

৪. তেমনি আমরা একই পবিত্র আত্মার শক্তিতে সকলেই ... হয়ে একই দেহের অঙ্গ হয়ে উঠেছি।

৫. তাই আমাদের ... এক।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ঈশ্বর কত সুন্দর করেই না	• খ্রীষ্টেরই দেহ
২. সব অঙ্গই দেহের	• অংশ হলো মস্তক
৩. একটি পরিবারের প্রধান বা কর্তা	• কেবলমাত্র একটি অঙ্গ নিয়ে নয়
৪. মানবদেহের প্রধান	• আমাদের এই দেহকে সৃষ্টি করেছেন
৫. সাধু পল বলেন আমাদের দেহ	• হলেন পিতা বা মাতা
	• সাথে যুক্ত রয়েছে

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ্রীষ্টমণ্ডলী কী?

ক. খ্রীষ্টের দেহ খ. ত্রিত্বের আত্মা

গ. খ্রীষ্টভক্তের গৃহ ঘ. পালকীয় কেন্দ্র

২. কোন সংস্কারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টমণ্ডলী খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সহভাগী হয়ে ওঠে?

ক. দীক্ষাস্নান খ. বিবাহ

গ. যাজকবরণ ঘ. রোগীলেপন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সোমার বাবা-মা দু'জনেই চাকরিজীবী। বাবা বিভিন্ন সংঘ, সমিতির সাথে জড়িত, গির্জার বিভিন্ন কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। দক্ষতার সাথে সমস্যার সমাধান করেন। এ সকল কারণে পরিবারেও যেকোনো ব্যাপারে বাবার সিদ্ধান্ত ও মতামতই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়।

৩. সোমার বাবার ভূমিকার মধ্য দিয়ে কী প্রকাশ পেয়েছে?

ক. খ্রীষ্টের ভূমিকা খ. পরিবারের অবদান

গ. পুরোহিতদের ভূমিকা ঘ. মণ্ডলীর অবদান

৪. সোমার বাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে পরিবারের প্রত্যেকে লাভ করে–

i. সমৃদ্ধি

ii. পরিত্রাণ

iii. সহযোগিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. স্কুলের প্রধান শিক্ষক তার সব শিক্ষকের কর্মদক্ষতা মেধা, সামর্থ্য সম্পর্কে অবগত। বিদ্যালয়ের সকল কাজে যার যার দক্ষতা অনুযায়ী তিনি সকলের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেন। কখনো দেখা যায় দু-একজনকে তিনি একাধিক দায়িত্ব দিয়ে থাকেন। এতে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ অসন্তুষ্ট হন এবং প্রধান শিক্ষককে বলেন, 'অন্যদের কেন কম দায়িত্ব দেওয়া হয়, তারাও তো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক।' প্রধান শিক্ষক বললেন, 'বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রত্যেকেই এই পরিবারের সদস্য। পরিবারে সকলে এক কাজ করে না। প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব পালন করে থাকে। কাজেই পরিবারে প্রত্যেকের গুরুত্ব সমান।'

১. খ্রীষ্টমণ্ডলীতে কাকে মস্তকস্বরূপ চিহ্নিত করা হয়?

২. 'আমি হলাম দ্রাক্ষালতা, তোমরা হলে শাখা-প্রশাখা'– উক্তিটি ব্যাখ্যা করো।

৩. শিক্ষকদের বিভিন্ন দায়িত্বের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টমণ্ডলীর কী প্রকাশ পেয়েছে?

৪. 'উদ্দীপকের শিক্ষকগণ যেন মণ্ডলীর এক একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ'– উক্তিটি মূল্যায়ন করো।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খ্রীষ্টমণ্ডলী বলতে কী বুঝ?

২. খ্রীষ্ট কেন খ্রীষ্টমণ্ডলীর মস্তক?

৩. কীভাবে খ্রীষ্টমণ্ডলী খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সহভাগী হয়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. খ্রীষ্টমণ্ডলীর মস্তক হিসেবে খ্রীষ্টের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

২. খ্রীষ্টদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হিসেবে খ্রীষ্টভক্তদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

৩. মণ্ডলীর অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে কীভাবে আগ্রহী হবে তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

নবম অধ্যায়

ন্যায্যতা, শান্তি ও আত্মসংযম

মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ ও বিশ্বায়নের এই যুগে আমাদের দরকার মানবীয়, নৈতিক ও ধর্মীয় গুণাবলি সমৃদ্ধ একটি খ্রীষ্টীয় সমাজ। যীশুর দেখানো পথ অনুসরণ করে চলার জন্য ও আদর্শ পরিবার গঠনের মাধ্যমে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে সর্বজনীন বিশ্বসমাজ গড়ে তোলার জন্য দরকার ন্যায্যতা। ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে, শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করার প্রয়োজনে সকলের সাথে সহাবস্থান করতে হবে এবং এর জন্য প্রত্যেকের মাঝে থাকতে হবে আত্মসংযম। এই সকল গুণ নিয়ে বেড়ে উঠলে অবশ্যই ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক পরিবেশ হবে সুখময়, যা সবারই কাম্য।

ন্যায্যতার প্রতীক দাঁড়িপাল্লা

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- ন্যায়বিচারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ন্যায়বিচার সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব;
- পরিবার ও সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারব;
- সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি আনয়নে ন্যায়বিচারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পবিত্র বাইবেলে আত্মসংযম বিষয়ক শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব;
- নিজ জীবনে আত্মসংযমের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শান্তিশৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজ গঠনে আত্মসংযমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নিজ জীবন, পরিবার ও সমাজে ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হব।

পাঠ ১ : ন্যায্যতা

ন্যায্যতা হলো একটি নৈতিক গুণ। ন্যায্যতাকে নৈতিক গুণ বলা হয় এই কারণে যে, এটি যার মধ্যে আছে, সে নৈতিক চরিত্রবান ব্যক্তিতে পরিণত হয়। ন্যায্যতা হচ্ছে ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর যা প্রাপ্য তা ফিরিয়ে দেওয়ার অবিচল ও অবিরাম ইচ্ছা। কাজেই ন্যায্যতা দুই রকমের আছে–ঈশ্বরের প্রতি ন্যায্যতা এবং মানুষের প্রতি ন্যায্যতা। ঈশ্বরের প্রতি ন্যায্যতাকে বলা হয় 'ধর্মের গুণ'। মানুষের প্রতি ন্যায্যতা হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মানব সম্পর্কের মধ্যে মিলন স্থাপনের ইচ্ছা জাগ্রত করা। এর ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় এমন এক সমতা যা ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গলের সাথে সম্পর্কিত। পবিত্র বাইবেলে ন্যায্যতার কথা বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। ন্যায্যতার নিজস্ব গভীরতম গুণ হলো সর্বদা অভ্যাসগত ও ন্যায়সংগত চিন্তা করা ও প্রতিবেশীর প্রতি আচরণে সর্বদা সততা বজায় রাখা।

ন্যায্যতার বিশেষ দিকগুলো হলো :

১। সঠিক, যুক্তিযুক্ত, যথাযথ বা সুবিবেচনাপূর্ণ হওয়া;

২। সমাজের প্রথাগত নৈতিক রীতিনীতির সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া বা সেগুলো অনুসরণ করে চলা;

৩। নৈতিক বাধ্যবাধকতাসমূহের প্রতি দৃঢ়ভাবে অনুগত থাকা;

৪। মানবীয় ও ঐশ্বরিক আইনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা;

৫। পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে সততা অনুসরণ করা;

৬। আচরণে ও মতামত প্রকাশে সৎ হওয়া এবং বাস্তবতার সাথে মিল রাখা;

৭। কাজেকর্মে সৎ, বিশ্বস্ত ও বিবেকবান থাকা।

ন্যায়ধর্মে অবিচল থেকে কাজ করা মানেই অপরের জন্য সঠিক কাজ করা। ন্যায় থেকে আসে ন্যায্যতা। ন্যায্যতা অন্তরে স্থান দেওয়ার অর্থই মানবিক মূল্যবোধে নিজেকে আলোকিত করা। যেকোনো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জন্য ন্যায্যতা অতীব প্রয়োজনীয় একটি গুণ, যা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে।

কাজ : সমাজের কোন কোন ক্ষেত্রে ন্যায্যতা আছে ও কোন কোন ক্ষেত্রে নেই। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তার একটি তালিকা তৈরি করো ও পোস্টারের মাধ্যমে উপস্থাপন করো।

পাঠ ২ : পবিত্র বাইবেলে ন্যায্যতা-বিষয়ক শিক্ষা

ঈশ্বর ন্যায়বান। পবিত্র বাইবেলের অনেক স্থানে আমরা এই বিষয়ে বক্তব্য শুনি। প্রবক্তা ইসাইয়ার মধ্য দিয়ে আমরা শুনতে পাই, "তবুও ঈশ্বর কিন্তু সেই দিনের প্রতীক্ষায় রয়েছেন, যখন তিনি তোমাদের প্রতি নিজের করুণা দেখাতে পারবেন; সেদিন তিনি তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ করে তোমাদের দয়াই করবেন। ঈশ্বর তো ন্যায়বান; তাঁর পথ চেয়ে থাকে যারা ধন্য-ধন্য তারা সকলেই!" (ইসা ৩০:১৮)। সামসংগীতে আমরা একই ভাব লক্ষ করি। এখানে বলা হয়েছে, "ধার্মিকতা ও ন্যায়নীতিতে পরম প্রীত তিনি; ঈশ্বরের ভালোবাসায় জগৎ উচ্ছলিত (সাম ৩৩:৫)। প্রবক্তা ইসাইয়ার মুখ দিয়েই আরও শুনি, "আমি এই যা বলছি, তা মন দিয়ে শোন তোমরা, যারা আমার আপন মানুষ; কান পেতেই শোন তোমরা, যারা আমার আপন জনগণ! শিক্ষাবাণী আমারই মুখ থেকে উচ্চারিত হবে, আমার ন্যায়নীতিকে আমি অচিরেই বিজাতীয়দের আলো করে তুলব" (ইসা ৫১:৪-৫)। "কারণ আমি, ঈশ্বর, ন্যায়নীতি ভালোবাসি, যত চুরি জোচ্চুরি ঘৃণার চোখেই দেখি; তাই বিশ্বস্তভাবেই তাদের পুরস্কৃত করব সেদিন" (ইসা ৬১:৮)।

ন্যায়বান ঈশ্বর তাঁর জাতিকে ন্যায্যতা সহকারে অর্থাৎ বিধিবিধান মতেই পালন করেন। মেষদলের সাথে তাঁর জাতির লোকদের তুলনা করে তিনি বলেন, "আমি নিজেই আমার মেষগুলোকে প্রতিপালন করব, নিজেই তাদের দেবো শয়নের স্থান, একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু ঈশ্বর। যে মেষটি হারিয়ে গেছে, তাকে খুঁজতে যাব; যেটি দলছাড়া হয়ে পড়েছে, তাকে দলে ফিরিয়েই আনব। যেটি আহত হয়েছে, তার ক্ষতস্থান আমি বেঁধে দেবো; যেটি রুগ্ণ, তাকে সুস্থ সবল করে তুলব। আর যে মেষটি নধর, যে মেষটি সুস্থ সবল, তাকে সর্বদাই আগলে রাখব আমি। আমার মেষগুলোকে আমি ন্যায্যতা সহকারেই প্রতিপালন করব" (এজেকিয়েল ৩৪:১৫-১৬)।

ন্যায়বান ঈশ্বরের কাছ থেকে দীনদুঃখীরা সুবিচার পাবেই। সামসংগীতের ভাষায় আমরা শুনতে পাই, "জানি, আমি জানি, দীনদুঃখী মানুষেরা ঈশ্বরের সুবিচার পাবে; দরিদ্ররা পাবে নিজেদের ন্যায্য অধিকার।" (সাম ১৪০:১২)। কিন্তু অন্যদিকে যীশু সমালোচনা করেন শাস্ত্রী ও ফরিসিদের। কারণ তারা ন্যায়নিষ্ঠতা পালন করেন না। তিনি বলেন, "হায় হায় আপনারা, শাস্ত্রীরা আর ফরিসিরা, যত ভণ্ডের দল! আপনারা তো আপনাদের পুদিনা, মৌরী আর জিরার দশ ভাগ নৈবেদ্য হিসাবে দিয়েই থাকেন, অথচ বিধানের গুরুতর নির্দেশগুলো যেমন : ন্যায়নিষ্ঠা, দয়ামায়া, বিশ্বস্ততার নির্দেশ–এগুলো আপনারা কিন্তু উপেক্ষাই করেন" (মথি ২৩:২৩)।

শিষ্যচরিত গ্রন্থে আমরা দেখি, ঈশ্বর জগৎসংসারের ন্যায়বিচার করবেন, "মানুষ যে যুগে এই কথা বুঝতে পারত না, সেই যুগে পরমেশ্বর তা ক্ষমার চোখেই দেখেছেন; কিন্তু এখন মানুষের কাছে তাঁর আদেশ এই যে, সকল জায়গার সকল মানুষকেই মন ফেরাতে হবে। কারণ তিনি এমন

একটি দিন স্থির করে রেখেছেন, যেদিন তিনি জগৎ সংসারের ন্যায়বিচার করবেন; আর তিনি তা করবেন তাঁরই মনোনীত একজন মানুষের দ্বারা। এর প্রমাণও তিনি তো দিয়েছেন; সেই মানুষটিকে তিনি তো মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন" (শিষ্য ১৭:৩০-৩১)। তাই সামসংগীতের মাধ্যমে ন্যায়বান মানুষকে প্রশংসা করা হচ্ছে –"ধন্য তারা, ন্যায়নীতি মেনে চলে যারা, সর্বদাই ন্যায়কর্ম করে চলে যারা" (সাম ১০৬:৩)।

ন্যায়বান ঈশ্বর চান তাঁর জাতির লোকেরা যেন ন্যায়বান হয়ে ওঠে, "শোন, মানুষ, যা শ্রেয়, যা ঈশ্বর তোমার কাছ থেকে পেতে চান, তা তিনি তো নিজেই তোমাকে জানিয়ে দিয়েছেন! আর কিছু নয় শুধুমাত্র ন্যায়ধর্ম পালন করা, ভক্তি ভালোবাসাকে হৃদয়ে গেঁথে রাখা আর নম্র চিত্ত নিয়ে তোমার ঈশ্বরের সঙ্গী হয়ে জীবনপথে চলা, আর কিছু নয়, এই তো তিনি চান" (মিখা ৬:৮)। খাঁটি ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ঈশ্বর আরও বলেন,"বিশ্বপতি ঈশ্বর তো বারবার এই কথা বলছেন : ন্যায়নীতির মানদণ্ডেই শাসন করো! একজন আর একজনের প্রতি ভালোবাসা, মায়ামমতা দেখাও। কোনো বিধবা, অনাথ, প্রবাসী বা দীনজনের উপর শোষণ চালিও না। মনে-মনে কেউ কারও অনিষ্ট করার মতলব এঁটো না" (জাখারিয় ৭:৯)। ঈশ্বর চান যেন তাঁর সেবক নিজ দেশে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করেন, "এই দেখ আমার সেবক, আমার মনোনীত জন; এ আমার একান্ত প্রিয়জন, আমার প্রাণের প্রীতিভাজন! আমি এর উপর আমার আত্মিক প্রেরণার অধিষ্ঠান ঘটাব; এ তো সকল জাতির কাছে ঘোষণা করবে ঐশ ন্যায়নীতির বাণী" (মথি ১২:১৮)। তাই তাঁর সেবকের ডাক শুনে কেউ যদি না-ও আসে, তবুও একা হলেও তাকে ন্যায়নীতি অনুসরণ করতে হবে, "ন্যায়নীতির পথেই চলবে তুমি, ন্যায়নীতিরই পথে, তাহলে তুমি প্রাণে বেঁচে থাকবে এবং তোমার ঈশ্বরের দেওয়া দেশ নিজের অধিকারে রাখতেও পারবে" (দ্বিঃবিঃ ১৬:২০)। ঈশ্বর তাঁর সেবককে স্মরণ করিয়ে দেন, তিনি যেন সকলের জন্যই ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন, "যে লোক প্রবাসীকে, অনাথকে বা বিধবাকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তার উপর বর্তাবে অভিশাপ!" (দ্বিঃবিঃ ২৭:১৯)।

ইসাইয়া বলেন, "হায় রে তারা, যারা অন্যায় যত বিধিনিয়ম জারি করে থাকে, যারা রচনা করে যত অত্যাচারের আইন। এভাবে তারা দুর্বল-অসহায় মানুষকে ন্যায়বিচার পেতেই দেয় না, আমার জাতির যত দীনদরিদ্রকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিতই করে। তারা বিধবাদের করে তোলে নিজেদের স্বার্থের শিকার; অনাথদের সবকিছু কেড়ে নেয় তারা" (ইসা ১০:১-২)

কাজ : ন্যায্যতা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের উদাহরণগুলোর সারাংশ খাতায় লেখো।

পাঠ ৩ : পরিবার ও সমাজে ন্যায্য প্রতিষ্ঠা

অষ্টকল্যাণ বাণীর চতুর্থ বাণীতে যীশু বলেছেন, "ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, ধন্য তারা–তারাই পরিতৃপ্ত হবে" (মথি ৫:৬)। ধর্মময়তার অর্থ ন্যায্যতা। ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য যারা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত, অর্থাৎ যাদের মনে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য একান্ত বাসনা আছে ও সর্বদা শতকরা একশত ভাগ চেষ্টা করে, তারা ঈশ্বরের চোখে ধন্য। সাধু টমাস আকুইনাসের মতে "ন্যায্যতা হলো যার যা প্রাপ্য তাকে তা ফিরিয়ে দেওয়ার ক্রমাগত ইচ্ছা।" 'যার যা প্রাপ্য' বলতে দুই ধরনের পাওনা বোঝায়। প্রথমটা হলো মানুষের প্রাপ্য আর দ্বিতীয়টা হলো ঈশ্বরের প্রাপ্য। যীশু একবার বলেছিলেন, যা সিজারের, তা সিজারকেই (অর্থাৎ মানুষকে) দাও; আর যা ঈশ্বরের, তা ঈশ্বরকেই দাও" (মথি ২২:২১)। এই দুই ধরনের প্রাপ্য যখন আমরা মিটিয়ে দিতে পারি তখনই আসে প্রকৃত ন্যায্যতা।

প্রথমে আমরা দেখি কীভাবে আমরা ঈশ্বরের প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে পারি। ঈশ্বরের প্রাপ্য যথাযথভাবে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারি :

১। সব সময় ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করা বা তাঁর ইচ্ছানুসারে কাজ করা। আমাদের বিবেকের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পারি। বিবেকের কথা মেনে কাজ করলে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে চলা হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে চলার জন্য যদি আমরা সত্যিই তৃষ্ণার্ত হই তবে আমাদের ভিতর থেকে সর্বদাই তাঁর ইচ্ছা পালনের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠবে। প্রভু যীশু সর্বদা পিতার ইচ্ছা পালন করতেন। কারণ তিনি পিতার ইচ্ছা পালনের জন্য তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত ছিলেন। যীশু বলেন, "যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গেই আছেন। যে সমস্ত কাজে তিনি প্রীত হন, আমি সর্বদা তা-ই করে থাকি" (যোহন ৮:২৯)। তিনি আরও বলেন, "যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা মেনে চলা এবং তাঁর দেওয়া কাজ সম্পন্ন করা, সেই তো আমার খাবার" (যোহন ৪:৩৪)। গেৎসিমানি বাগানে প্রার্থনা করার সময়ও যীশু পিতার ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : পিতা, আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। এভাবে পিতার ইচ্ছা পালনের মাধ্যমে যীশু পিতার সাথে সম্পর্ক রাখেন। তাই তিনি তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশে বলেন, যারা আমাকে শুধু "প্রভু, প্রভু" বলে তারা নয়, বরং যারা পিতার ইচ্ছা জেনে তা পালন করে তারাই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে। তিনি আমাদেরকে যে প্রার্থনাটি শিখিয়েছেন, সেখানেও তিনি আমাদেরকে পিতার ইচ্ছা পালনের বিষয়টি শিখিয়েছেন। আর একবার তিনি যখন লোকদের মাঝে কথা বলছিলেন, তখন একজন এসে বলল যে তাঁর মা ও ভাইয়েরা বাইরে অপেক্ষা করছেন। তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "কে আমার মা, আর কারাই বা আমার ভাই? যে-কেউ আমার স্বর্গনিবাসী পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই তো আমার ভাই, আমার বোন, আমার মা" (মথি ১২:৪৬-৪৯)।

২। আমাদের প্রতিদিনকার দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের মধ্য দিয়েও পিতার ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। সেই কাজগুলো হোক ছোট হোক বড়, সবই আমাদের যথাযথ চেষ্টা করতে হবে ভালোভাবে করার জন্য। সেগুলো পালন করার মাধ্যমেও আমরা পবিত্রতার পথে এগিয়ে চলতে পারি। এগুলোর মাধ্যমেই আমরা পিতার যা প্রাপ্য তা পিতাকে দিতে পারি।

৩। আমাদের সকলকেই ঈশ্বর কিছু-না-কিছু গুণ দিয়েছেন। সেগুলো যদি আমরা যথাযথভাবে বিকশিত করে তোলার মাধ্যমে ফলশালী হই, তখন আমরা ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দিতে পারি। এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি যীশুর সেই উপমাটি। যে ব্যক্তি পাঁচ শ মোহর পেয়েছিল সে তা বাড়িয়ে এক হাজার বানিয়েছিল। যে ব্যক্তি দুই শ মোহর পেয়েছিল সেও তা বাড়িয়ে চার শ বানিয়েছিল। তাই মনিব তাদের দুইজনকেই প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তি এক শ মোহর পেয়েছিল সে তা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে রেখেছিল। মনিব তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন। আমাদেরও ঈশ্বর-প্রদত্ত গুণগুলো বাড়িয়ে তুলতে হবে। তবেই আমরা ঈশ্বরের পাওনা ঈশ্বরকে দিতে পারি।

এবার আসা যাক মানুষের যা পাওনা তা মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টিতে। নিম্নলিখিতভাবে আমরা মানুষের পাওনা মানুষকে ফিরিয়ে দিতে পারি–

১। আমার পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলী–যেখানে আমি বাস করছি, আমার চারপাশে যারা আছে, তাদের প্রতি আমার করণীয়সমূহ যথাযথভাবে করার মাধ্যমে আমি তাদের পাওনা ফিরিয়ে দিতে পারি।

২। অন্যের প্রতি মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করে আমরা অন্যদের প্রতি তাদের প্রাপ্য ফিরিয়ে দিতে পারি।

৩। অন্যের বিশ্বাস, ধ্যানধারণা ইত্যাদিকে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিয়ে আমরা তাদের প্রাপ্য ফিরিয়ে দিতে পারি।

৪। চিন্তা, কথা ও কাজে সততার পরিচয় দিয়ে খাঁটি ও খোলামনের মানুষ হয়ে আমরা সকল মানুষের কাছে তাদের পাওনা ফিরিয়ে দিতে পারি।

৫। মানুষের মধ্য দিয়ে হোক বা সরাসরি হোক, প্রতিদিনই আমরা যতকিছু ঈশ্বরের কাছ থেকে পাচ্ছি, সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমরা অন্যদের পাওনা ফিরিয়ে দিতে পারি।

কাজ : ঈশ্বর ও মানুষের সাথে ন্যায্যতার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পার তা দুইটি কলামে লেখো।

পাঠ ৪ : ন্যায্যতার ফল শান্তি

পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষ শান্তি চায়। ঈশ্বরও সকল মানুষকে শান্তি দিতে চান। সেজন্যেই তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করেছেন। তিনি মানব হয়ে জন্মগ্রহণ করার বহু পূর্বে প্রবক্তা ইসাইয়ার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বলেছিলেন, "অন্ধকারে পথ চলছিল যারা, সেই জাতির মানুষেরা দেখেছে এক মহান আলোক; ছায়াচ্ছন্ন দেশে যারা বাস করছিল, তাদের উপর ফুটে উঠেছে একটি আলো। হে ঈশ্বর, তুমি তাদের দিয়েছ অসীম আনন্দ, কত গভীর তাদের উল্লাস। তোমার সঙ্গসুখে তারা আনন্দিত, মানুষ যেমন আনন্দিত হয় ফসল কাটার সময়ে, মানুষ যেমন উল্লসিত হয় লুণ্ঠিত সম্পদ ভাগ করার সময়ে। কেননা যে জোয়ালের ভার তাদের উপর চেপে বসেছিল, যে-বাঁক তাদের কাঁধের উপর দুর্বহ হয়ে উঠেছিল এবং তাদের নির্যাতকের সেই যে-বেতখানি, সবই তুমি ভেঙে ফেলেছ, যেমনটি ভেঙেছিলে মিদিয়ানের সেই পরাজয়ের দিনে। সৈন্যদের মাটি-কাঁপানো যত রণপাদুকা, রক্তমাখা যত পোশাক, সবই এবার পুড়িয়ে দেওয়া হবে, সবই আগুনের গ্রাসে ছাই হয়ে যাবে। কেননা আমাদের জন্যে একটি শিশু যে জন্ম নিয়েছেন, একটি পুত্রকে আমাদের হাতে যে তুলেই দেওয়া হয়েছে। তাঁর কাঁধের উপর রাখা হয়েছে সবকিছুর আধিপত্যভার। তাঁকে ডাকা হবে অনন্য পরিকল্পক, পরাক্রমী ঈশ্বর, শাশ্বত পিতা, শান্তিরাজ, এমনি সব নামে। আহা! এবার শুরু হবে দাউদের সেই সিংহাসনের, সেই রাজত্বের সুবিস্তৃত আধিপত্যের যুগ, অনন্ত শান্তির যুগ"(ইসা ৯:১-৬)।

উপরের এই শাস্ত্রপাঠ থেকে আমরা দেখতে পাই– পাপ দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। মানুষ ঈশ্বরের পাওনা ঈশ্বরকে দিতে ব্যর্থ হয়েছে, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাধ্য থাকতে ও তাঁকে ভালোবাসতে মানুষ ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর ন্যায়বান। মানুষের কষ্টের বোঝা এবার তিনি লাঘব করার জন্য দয়া দেখালেন।

আমরা উপরে দেখেছি, ন্যায্যতার ফল হলো শান্তি। কারণ আমরা জানি, যার যা পাওনা তাকে তা দিয়ে দেওয়ার অর্থই ন্যায্যতা। আমরা আরও দেখেছি ঈশ্বরের পাওনা ঈশ্বরকে দিলে এবং মানুষের পাওনা মানুষকে দিলে ন্যায্যতা হয়। এভাবে ঈশ্বর ও মানুষের সাথে আমাদের ন্যায্যতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ফলে সৃষ্টি হয় শান্তি। এখন কারও বিরুদ্ধে আর কারও কিছু বলার নেই। সবাই সুখী।

শাস্ত্রপাঠটিতে আমরা আরও দেখেছি, ঈশ্বর মানুষের সাথে সম্পর্ক সুন্দর করার জন্য নিজেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজেই তাঁর পুত্রকে পাঠিয়েছেন। পুত্র ঈশ্বর আমাদেরকে পাপের ছায়া থেকে উদ্ধার করার জন্য ক্রুশের উপর প্রাণ দিয়েছেন। এভাবে তিনি ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে পুনর্মিলন স্থাপন করেছেন। এখন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে আর দূরত্ব নেই। আমাদের এখন সর্বদা চেষ্টা করে চলতে হবে যেন ঈশ্বরের সাথে আমাদের এই সম্পর্ক নষ্ট না হয়। আমরা যেন আমাদের পাপ দ্বারা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে না যাই।

আরও একটা দিকে আমাদের লক্ষ রাখতে হবে, মানুষের সাথে আমাদের সম্পর্ক ঠিক রাখতে হবে। আমরা যখন প্রত্যেক মানুষকে তাদের পাওনা মিটিয়ে দিই,তখনই মানুষের সাথে আমাদের ন্যায্যতার সম্পর্ক বিরাজ করে। এই ন্যায্যতার ফলে বিরাজ করে শান্তি।

কাজ : ১। নিজ নিজ পরিবারে শান্তি বজায় রাখার জন্য তুমি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পার তা লেখো।

কাজ : ২। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত ও দলীয়ভাবে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়,তা দলীয় আলোচনার মাধ্যমে খুঁজে বের কর ও উপস্থাপন করো।

পাঠ ৫ : আত্মসংযম

আত্মসংযম হচ্ছে নিজের আবেগ-অনুভূতি এবং বিভিন্ন কিছুতে নিজের প্রতিক্রিয়া দমন করার সক্ষমতা। অন্য কথায় এটাকে আমরা বলে থাকি আত্মশৃঙ্খলাবোধ। কেউ কেউ হয়তো মনে করতে পারে আত্মসংযম দ্বারা মানুষের আচরণ সীমিত করে ফেলা হয়। কিন্তু আসলে তা নয়। বিজ্ঞতা ও সাধারণ জ্ঞান নিয়ে ব্যবহার করলে আত্মসংযম আত্ম-উন্নয়ন ও কৃতকার্যতা অর্জনের একটা বড় হাতিয়ার হিসাবে কাজ করতে পারে।

নিম্নলিখিতভাবে আত্মসংযম আমাদের উপকারে আসে

১। এটি আমাদেরকে মাদকাসক্ত হওয়ার মতো আত্মবিধ্বংসীমূলক কাজ করা অথবা মোহাবিষ্ট হয়ে খারাপ পথে পা বাড়ানো থেকে বিরত রাখে;

২। নিজের ব্যক্তিত্বের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ রাখতে এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গঠন করতে সহায়তা করে;

৩। অত্যধিক আবেগপ্রবণ কাজ করা থেকে বিরত রাখে অর্থাৎ আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে;

৪। অসহায়বোধ জাগতে দেয় না এবং অন্যদের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা কমায়;

৫। আত্মসংযম দ্বারা আমরা মানসিক ও আবেগিক নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হই। এরূপ সংযম মনের প্রশান্তি আনয়নে সহায়তা করে;

৬। এটি আমাদের মেজাজ ঠান্ডা রাখতে এবং নেতিবাচক চিন্তা ও অনুভূতিগুলো বর্জন করতে শেখায়;

৭। আত্মসংযম আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ, দৃঢ়চিত্ততা, অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি দৃঢ়তর করে;

৮। এটি আমাদের নিজের জীবনের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করতে সক্ষম করে তোলে;

৯। এটি আমাদেরকে দায়িত্বশীল ও বিশ্বাসযোগ্য মানুষে পরিণত করে।

আত্মসংযমের এত উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও এর পথে অনেক বাধাবিঘ্ন রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ :

১। আত্মসংযম সম্পর্কে আমাদের যথাযথ জ্ঞানের অভাব একটি বড় বাধা;

২। কঠিন ও অনিয়ন্ত্রিত আবেগিক প্রতিক্রিয়া;

৩। পূর্বাপর চিন্তাভাবনা না করে, শুধু বাহ্যিক চেহারা দেখেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা;

৪। শৃঙ্খলাবোধ ও ইচ্ছাশক্তির অভাব;

৫। নিজেকে পরিবর্তন ও বিকশিত করার ইচ্ছার অভাব;

৬। আচরণ সীমিতকরণের মাধ্যম হিসেবে আত্মসংযমকে দেখা।

পাঠ ৬ : পবিত্র বাইবেলে আত্মসংযম বিষয়ক-শিক্ষা

আত্মসংযমের একটা মূল্যবান শিক্ষা আমরা পাই আদিপুস্তকে কুলপতি যোসেফের কাছ থেকে। যোসেফের ভাইয়েরা তাঁর উপর ঈর্ষান্বিত ছিল। তারা যোসেফকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে মিশরীয় বণিকদের কাছে বিক্রি করে দিলো। বণিকরা তাঁকে নিয়ে বিক্রি করল ফারাও রাজার রক্ষীদলের প্রধানের কাছে।

যোসেফ সেই প্রধানের বাড়িতে সব কাজকর্মের দায়িত্ব পেলেন। যোসেফ ছিলেন লম্বাদেহী সুদর্শন যুবক। কিছুদিন যেতেই তার প্রতি মনিবের স্ত্রীর কামলালসা জাগল। তিনি তাঁকে মন্দ কাজে অনেক প্রলোভন দিলেন। কিন্তু সব সময়ই যোসেফ তাকে বললেন "না।" এতে মনিবের স্ত্রী প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাঁর নামে মিথ্যা অপবাদ রটালেন। ফলে যোসেফকে জেল খাটতে হলো। এতেও যোসেফ তাঁর নীতিতে অটল থাকলেন।

যোসেফের মধ্যে আমরা দেখি সাধু পলের একটা শিক্ষা যথাযথভাবেই বাস্তবায়িত হয়েছে। সাধু পল বলেন, "তাই বলছি, ব্যভিচার থেকে দূরেই থাকো। মানুষ আর যেকোনো পাপই করুক না কেন, সে সব পাপ ঘটে দেহের বাইরে। কিন্তু ব্যভিচার যে করে, সে আপন দেহের বিরুদ্ধে গিয়েই পাপ করে। তোমরা কি এই কথা জানো না যে, তোমাদের দেহ হলো তোমাদের অন্তর-নিবাসী সেই পবিত্র আত্মার মন্দির, যাঁকে তোমরা পেয়েছ পরমেশ্বরের কাছ থেকে; তোমরা তো নিজেদের মালিক নও; প্রভু মূল্য দিয়ে তোমাদের যে কিনেই নিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈহিক আচরণের মধ্য দিয়েই পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশ করো" (১করি ৬:১৮-২০)।

দানিয়েল নামে ছিলেন একজন যুবক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও তিনজন যুবক, যথাক্রমে হানানিয়া, শাদ্রাক ও মিশায়েল। তাঁদের জন্য রাজা তাঁর টেবিল থেকে খুব সুস্বাদু আমিষ জাতীয় খাবার পাঠাতেন। কিন্তু তাঁরা সেগুলো না খেয়ে নিরামিষ খাবার খেতেন। তাঁরা দীর্ঘদিন যাবৎ শুধু নিরামিষ

২০১৫

খাবার খেয়ে সুন্দর স্বাস্থ্য ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁরা ঐ রাজ্যে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হতে পেরেছিলেন। এটা তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল। কারণ তাঁরা আত্মসংযম করতে শিখেছিলেন।

আত্মসংযমের সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা পেতে পারি যীশুখ্রীষ্টের কাছ থেকে। পবিত্র বাইবেলে আমরা দেখতে পাই দীক্ষাস্নান লাভের পর শয়তান যীশুকে নিয়ে গেল মরুপ্রান্তরে। সেখানে তিনি চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত উপবাস করেছিলেন। অনাহারে থাকার দরুন তিনি খুব ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন। এই অবস্থায় শয়তান তাঁকে প্রলোভন দিতে এসেছিল। সব পরীক্ষা যীশু জয় করতে পেরেছিলেন প্রার্থনার শক্তিতে। যীশু শয়তানকে বলেছিলেন–'দূর হও শয়তান।' সেই মুহূর্তেই শয়তান তাঁর কাছ থেকে দূর হয়ে গেল।

কাজ : পবিত্র বাইবেলের আত্মসংযম–বিষয়ক শিক্ষাগুলো কী কী ভাবে বর্তমান যুগের জন্য প্রযোজ্য তা দলীয় আলোচনার মাধ্যমে খুঁজে বের করো ও পোস্টারের সাহায্যে উপস্থাপন করো।

পাঠ ৭: ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে আত্মসংযম

মানুষ একা একা বাস করতে পারে না কারণ মানুষ সামাজিক জীব। তার বাস করতে হয় সমাজের অন্যদের সাথে মিলেমিশে। যাদের সাথে সে বাস করে তারাও তারই মতো সামাজিক। তাই তাদের সাথে তার সামাজিক আচরণ করতে হয়। সকলের সাথে শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে জীবনযাপন করার লক্ষ্যে মানুষকে অনেক ব্যাপারে নিজের আবেগ-অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। অন্যকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নিজের অনেক কিছু প্রকাশ না করে থাকতে হয়।

প্রাথমিকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পর্ক রচনা করতে হয় পরিবারের অন্যান্য সদস্য, পরিবারের বাইরের বন্ধু-বান্ধব ও বিভিন্ন পরিচিতদের সাথে। একসাথে থাকতে গেলে পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর হয় আদান-প্রদানের মাধ্যমে। পাওয়ার চাইতে দেওয়ার উপর যারা জোর দেয় বেশি তারা সুখীও হয় বেশি। কারণ যারা দেওয়ার চাইতে পাওয়ার উপর বেশি জোর দেয় তারা অপরের কাছে ঋণী হয়ে যায়। তাতে অন্তরে আনন্দ থাকে না। সেই জন্য পাওয়ার জন্য একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা দমন করতে শিখতে হয়।

আত্মসংযম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে

বিবাহের দিন থেকে শুরু করে স্বামী ও স্ত্রী একসাথে থাকতে শুরু করে। সারা জীবনই তারা একত্রে থাকে। দুইজনের ব্যক্তিত্ব দুই রকম। তাদের আচার-আচরণের রীতিনীতিও ভিন্ন। এই পার্থক্যগুলো আছে বলে সহজেই তাদের একের বিরুদ্ধে অপরের অনেক কিছু বলার থাকে। কিন্তু বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হয়ে একত্রে মিলেমিশে থাকার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন বলে তারা আত্মসংযম করেন ও অনেক কিছু ক্ষমার চোখে দেখেন। ফলে তাদের ঝগড়া-বিবাদের পরিমাণ অনেক কমে

২০২৫

আসে। এভাবেই তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক সুন্দর ও মধুর হয়। স্বামী-স্ত্রী সবসময় একে অপরের বিষয়ে মন্তব্য করার ফলে পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। সেজন্যে কখনো কখনো চুপ থাকা বাঞ্ছনীয়। এই ক্ষেত্রে দরকার হয় আত্মসংযম।

পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্কে আত্মসংযম

পৃথিবীর মধুরতম সম্পর্কগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যকার সম্পর্ক। কিন্তু সন্তান তার মা ও বাবার সাথে এক পরিবারে বসবাস করতে করতে অনেকবার পরিবারে বিবাদ বা ঝগড়াঝাঁটি দেখে থাকে। সন্তানটি যখন দৈহিকভাবে বড় হতে থাকে তখন তার দৈহিক নানাবিধ পরিবর্তন দেখা দেয়। এর ফলে তার মনের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে। অনেক সময় সন্তানদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। এসময় মা ও বাবাকে অসীম আত্মসংযমের পরিচয় দিতে হয়, সন্তানদের সাথে তাদের প্রচুর পরিমাণে ধৈর্যশীল হতে হয়। সন্তানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করার জন্য বাবা ও মা উভয়কেই অনেক অপেক্ষা করতে হয়। এসময় তাদের আত্মসংযম দরকার হয়। উদাহরণস্বরূপ, সন্তান কোনো ভুল করলে বাবা-মা যদি উত্তেজিত হয়ে সন্তানকে গালাগালি করতে শুরু করে বা মারধরও করে ফেলে তাতে সন্তানের সাথে মা-বাবার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং মা-বাবা সন্তানদের সাথে সহনশীল আচরণ করতে থাকবেন যতদিন সন্তান বয়স্ক হয়ে নিজে জেনে শুনে দায়িত্বশীল আচরণ না করে।

ভাইবোনদের মধ্যকার সম্পর্কে আত্মসংযম

শৈশবে বা তরুণ বয়সে ভাইবোনেরা অনেক সময়ই আবেগপূর্ণ হয়ে থাকে। তারা কথা কাটাকাটি, এমনকি অনেক সময় ঝগড়ায়ও লিপ্ত হয়ে যায়। যুক্তি দিয়ে কথা বলা এবং যুক্তি সহজভাবে গ্রহণ করার তাৎপর্য তারা বুঝে উঠতে পারে না। ভাইবোনেরা কোনো কোনো সময় মা-বাবার অনুপস্থিতিতে কোনো পরিবেশে থাকলে তাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ সে সাধারণত তুলনামূলকভাবে বেশি দায়িত্বশীল ও সহনশীল হয় এবং বাবা ও মায়ের ভূমিকা পালন করে থাকে। তখন তাদের সহনশীল হতে হয়। এই বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে আত্মসংযমের ভাব গড়ে উঠে। কেননা, যদি কখনো ছেলেমেয়েরা আত্মসংযমের অভাবের পরিচয় দেয় তখন বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা বা অন্য কোনো গুরুজন তাদের তিরস্কার করে। এগুলো যেন ভবিষ্যতে আর শুনতে না হয় সেই জন্য ছেলেমেয়েরা আত্মসংযমের চর্চা করতে শুরু করে। এভাবে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে আত্মসংযম দৃঢ় হয়ে উঠে।

বয়োজ্যেষ্ঠ ভাইবোনদের মধ্যে কখনো ঝগড়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে অন্তত একজনকে আগে আত্মসংযমের পরিচয় দিতে হয়। আর তখন তাদের মধ্যে পরিবেশ আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠে।

পরিবারের বাইরে পরিচিতদের সাথে আত্মসংযম

প্রত্যেক পরিবারের সদস্যদের সাথে তাদের পরিবারের বাইরে অনেকের সাথে পড়াশুনা বা কর্তব্যের খাতিরে বন্ধু-বান্ধব তৈরি হয় বা পরিচয় হয়। পরিবারের সদস্যদের সাথে যতখানি খোলামেলা

কথা বলা যায় বা প্রয়োজনে কথা কাটাকাটি করা যায়, বাইরের পরিচিত বা বন্ধুদের সাথে ততখানি করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে অনেক আত্মসংযমের পরিচয় দিতে হয়। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই আত্মসংযম জন্ম নেয়। উদাহরণস্বরূপ ঘরে বাবা অথবা মা তিরস্কার করলে বা গালি দিলে যেভাবে প্রতিক্রিয়া করা যায়, অফিসের বসের সাথে সেভাবে করা যায় না। এক্ষেত্রে অনেক আত্মসংযম প্রয়োজন হয়।

এক ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনেকাংশে নির্ভর করে আত্মসংযমের উপর। মতামত প্রকাশে বা যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে যত বেশি সংযমী হওয়া যায়, পারস্পরিক সম্পর্ক তত বেশি গভীর হয়। এভাবে নিজ নিজ আত্মসম্মানবোধও বৃদ্ধিলাভ করে।

কাজ : ব্যক্তিগত জীবনের আত্মসংযম কীভাবে সমাজের উপকারে আসতে পারে তা খাতায় লেখো।

পাঠ ৮ : অন্তরে আত্মসংযম রোপণ করা

১। প্রথমে আমাকে খুঁজে বের করতে হবে আমার জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মসংযম দরকার। সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ হতে পারে :

ক) খাওয়াদাওয়া

খ) বিশ্রাম

গ) মানুষের সাথে কথা বলা

ঘ) পরচর্চা

ঙ) ধূমপান

চ) খেলাধুলা

ছ) শিশুদের সাথে আচরণ

২। উপরের কোন দিকটির কী ধরনের আবেগ (যেমন, রাগ, চাপা ক্ষোভ, অসন্তোষ, হতাশা, আনন্দ ও ভয়) আমার দমন করা বেশি প্রয়োজন?

৩। কী ধরনের চিন্তা ও বিশ্বাস আমাকে ঐ ধরনের আচরণের মুখে ঠেলে দেয়?

৪। নিচের বিষয়গুলোর একেকটার উপর একেকবার কিছুক্ষণ চিন্তা করব। এভাবে দিনের মধ্যে কয়েকবার বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করব, বিশেষভাবে যে মুহূর্তগুলোতে আমার আত্মসংযম খুব দরকার হয় তখন –

ক) মনে মনে দুই-এক মিনিট যাবৎ বলব– আমার নিজের চিন্তা ও অনুভূতির উপর সম্পূর্ণ দখল আছে।

খ) নিজের চিন্তা ও অনুভূতি বাছাই করে নিয়ে সেগুলোর মধ্যে অনুরক্ত হওয়ার শক্তি আমার মধ্যে আছে।

গ) আত্মসংযম আমার মধ্যে অভ্যন্তরীণ শক্তি জাগ্রত করে ও আমাকে জয়লাভ করতে সাহায্য করে।

ঘ) যেকোনো বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সময় আমি নিজেকে দমন করতে পারি।

ঙ) আমি নিজেই আমার নিজের আচরণের কর্তা।

চ) আমি ক্রমান্বয়ে আমার অনুভূতিগুলোকে দমন করতে পারছি।

ছ) ঈশ্বর আমাকে আমার জীবন পরিচালনা করার শক্তি দিয়েছেন।

জ) প্রতিদিনই অল্প অল্প করে আমার চিন্তা ও অনুভূতি দমনের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঝ) আত্মসংযম অনুশীলন করে আমি আনন্দ পাই।

৫। এবার মনে মনে কল্পনা করি যে আমি আত্মসংযম অনুশীলন করছি। অতীতে যেখানে আমি আত্মসংযম করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম সেরকম একটা ঘটনা স্মরণ করি। এবার মনে মনে কল্পনা করি যে সেই ঘটনাতেই আমি এবার আত্মসংযম করতে সক্ষম হচ্ছি।

৬। আমার আত্মসংযমের শক্তি তখনই বৃদ্ধিলাভ করবে ও শক্তিশালী হবে যখন আমি এটার যথাযথ অনুশীলন করব। অন্তরে আত্মসংযম রোপণ করার জন্য এটিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

আত্মসংযম আমাদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ গুণ যে, এর মধ্য দিয়ে আমরা সমস্ত রকমের ভয়ভীতি, আসক্তি, অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ পরিত্যাগ করতে সক্ষম হই। এর দ্বারা মানুষের সাথে আমাদের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে, ধৈর্য ও সহনশীলতা বৃদ্ধিলাভ করে। এভাবে আমরা জীবনে বড় বড় ক্ষেত্রে জয়লাভ করতে পারি, মহৎ মহৎ অর্জন সম্ভব হয় এবং জীবনটা আনন্দের হয়ে উঠে।

কাজ : ১। তুমি কীভাবে নিজ অন্তরে আত্মসংযম রোপণ করবে তা চিন্তা করে বের কর ও খাতায় লেখো।

কাজ : ২। যে সমস্ত বন্ধুর আত্মসংযমের অভাব আছে তাদের জীবনে আত্মসংযম আনয়নের জন্য তোমরা সম্মিলিতভাবে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পার তা স্থির কর ও উপস্থাপন করো।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ঈশ্বরের প্রতি ন্যায্যতাকে বলা হয় ‘ ... ।’

২. ন্যায়বান ঈশ্বর তাঁর জাতিকে ... সহকারে অর্থাৎ ঠিকমতোই পালন করেন ।

৩. ‘আমার মেষগুলোকে আমি ... সহকারেই প্রতিপালন করব ।’

৪. আমাদের প্রতিদিনকার দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের মধ্য দিয়েও ... ইচ্ছা প্রকাশিত হয় ।

৫. মানুষ হিসেবে আমরা সবাই ... ।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ন্যায্যতা অন্তরে স্থান দেওয়ার অর্থই	• দীন-দুঃখীরা সুবিচার পাবেই
২. আমাদের বিবেকের মধ্য দিয়ে আমরা	• আমাদের জীবনে শান্তির উৎস
৩. আমাদের সকলকেই ঈশ্বর	• উপর ঈর্ষান্বিত ছিল
৪. প্রভু যীশু হলেন	• মানবিক মূল্যবোধে নিজেকে আলোকিত করা
৫. যোসেফের ভাইয়েরা যোসেফের	• ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পারি
	• কিছু না কিছু গুণ দিয়েছেন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ধর্মময়তার অর্থ কী?

ক. শান্তি খ. ভালোবাসা
গ. আত্মসংযম ঘ. ন্যায্যতা

২. কোনো কোনো লোককে ঈশ্বর কেন নিজের সন্তান বলে ডাকেন?

ক. লোকদের জীবনে শান্তি আনার জন্য খ. দীন-দুঃখীদের দয়া করার জন্য
গ. অত্যাচার সহ্য করে বলে ঘ. লোকদেরকে সম্মান করে বলে । ১৫১

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

দত্তপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেনেডিক্ট নামে একজন শিক্ষক ছিলেন। ঐ বিদ্যালয়ে তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। হঠাৎ তিনি কঠিন রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়ে চাকরি ছেড়ে দিলে প্রধান শিক্ষক তাঁর প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা না দিয়ে বিদায় দিলেন। বিষয়টি ধর্মপল্লির পুরোহিত জানতে পেরে বেনেডিক্টকে ডেকে তার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাসহ সকল পাওনা পরিশোধ করেন।

৩. পুরোহিতের মধ্যে কোন গুণাবলি প্রকাশ পেল?

ক. ন্যায্যতা খ. দয়া

গ. করুণা ঘ. সহানুভূতি

৪. পুরোহিতের কাজের জন্য ঈশ্বর তাকে—

i. প্রতিপালন করবেন

ii. সর্বদাই আগলে রাখবেন

iii. গুরুদায়িত্ব দেবেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রুমা দরিদ্র পরিবারের সন্তান। পরিবারের অবস্থা খুব খারাপ হওয়ায় সে একটি বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ নিল। ঐ বাড়ির গৃহকর্ত্রী রুমাকে পরীক্ষা করার জন্য অনেক টাকা পয়সা ও স্বর্ণের গহনা তার সামনে খোলামেলা অবস্থায় রেখে দিতেন। কিন্তু রুমা সেই সকল জিনিস কখনো ধরে দেখেনি। গৃহকর্ত্রী দেখলেন যে রুমার মধ্যে এ সকল জিনিসের প্রতি কোনো লোভ বা আকর্ষণ নেই। এমনকি রুমা ঐ গৃহে অনেক ভালো ভালো খাবার ছিল সেগুলোর স্বাদ সে কখনো গ্রহণ করেনি। সে ঐ সকল খাবারই খেত যা তার জন্য উন্মুক্ত ছিল। ঐ গৃহকর্ত্রী তার আচরণে মুগ্ধ হয়ে তাদের বাড়িতে সুন্দর একটি ঘর তৈরির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক অনুদান নেওয়ার প্রস্তাব করেন। রুমা গৃহকর্ত্রীকে তার সুন্দর প্রস্তাবের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কিন্তু ঐ অনুদান সে গ্রহণ করেনি।

ক. সমস্ত জগৎ লাভ করার প্রত্যাশী ব্যক্তি কী হারায়?

খ. শান্তি খুঁজে পাবার উপায় ব্যাখ্যা করো।

গ. রুমার আচরণে খ্রিষ্টীয় কোন গুণাবলি প্রকাশ পায়—পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'রুমাই পারবে নববেশরূপে খ্রিষ্টকে পরিধান করতে'—এ বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত পোষণ করো? তোমার মতামত দাও।

২. রবি পালমা একজন আদর্শ ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার। তিনি এলাকার উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজ দক্ষভাবে করে থাকেন। তিনি কখনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন না সুবিচারের জন্য তিনি তার জনপ্রিয়তার কথাও চিন্তা করেন না। তাঁর এলাকায় এক পরিবারে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়া বাধে। তাদের পৈতৃক সম্পত্তির সঠিক বন্টনের বিষয় নিয়েই তাদের মধ্যে মতানৈক্য। বড় ভাই ছোট ভাইকে সমপরিমাণ জায়গা দিতে চায় না কারণ সে তার সৎ ভাই। রবি মেম্বার বিষয়টি জানতে পেরে একটি মীমাংসা সভার আয়োজন করেন। তিনি বড় ভাইকে বলেন, 'তুমি যদি তোমার ভাইকে সমপরিমাণ জায়গা না দাও তাহলে ঈশ্বরের কাছ থেকে তুমি যথেষ্ট আশীর্বাদ পাবে না।'

ক. আত্মসংযমের মূল্যবান শিক্ষা আমরা কোথা থেকে পাই?

খ. শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

গ. দুই ভাইয়ের সম্পর্ক উন্নয়নে রবি পালমার কোন গুণাবলি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা করো।

ঘ. রবি পালমার পরামর্শ গ্রহণ না করলে দুই ভাইয়ের পারিবারিক বন্ধন মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে বলে কি মনে করো?— তোমার যুক্তি উপস্থাপন করো।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ন্যায্যতা বলতে কী বোঝায়?

২. ঈশ্বরের প্রাপ্য বলতে কী বোঝায়?

৩. আত্মসংযম বলতে কী বুঝ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ন্যায়বিচার সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করো।

২. নিজ জীবনে আত্মসংযমের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো।

৩. শান্তি শৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজ গঠনে আত্মসংযমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

দশম অধ্যায়

ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী

এই অধ্যায়ে আমরা একজন মহৎ ব্যক্তির জীবনী নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। শুরুতে বলা উচিত যে, মহৎ ব্যক্তিরা আমাদের মতো মানুষ ছিলেন। তাঁদের অনেকেই আবার সাধারণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তবে পিতা-মাতা ও গুরুজনদের জীবনাদর্শ ও শিক্ষা-দীক্ষায় বড় হয়ে, সাধনা বলে নিজের মন-মনন ও মেধাকে বিকশিত করে তাঁদের অনেকে মানব-পরিবারের জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে ইতিহাসে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে উঠেছেন। এ জন্যই বলা হয় : জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভালো। অর্থাৎ মানুষ তার জন্মের জন্য দায়ী নয়, কিন্তু কর্মের জন্য অবশ্যই দায়ী। কর্মগুণেই মানুষ ইতিহাসে খ্যাতিমান হয়ে উঠেন। এরূপ মহৎ ব্যক্তির জীবনী পাঠ করে আমরাও অনুপ্রাণিত হই এবং নিজেদের মেধা ও গুণাবলি বিকাশে যত্নবান হই। তোমরা হয়তো ইতিহাসের খ্যাতনামা বীর, রাজা-বাদশা, কবি-সাহিত্যিক, দার্শনিক, লেখক, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক, এমনকি সাধু-সাধ্বির নাম শুনেছ এবং তাদের জীবনী পাঠ করে তোমাদের মনে সুন্দর স্বপ্ন জেগেছে। আসলে ছাত্র জীবন তো সেরূপ স্বপ্ন দেখার ও সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সাধনা করারই সময়। তোমাদের সকল শুভাকাঙ্ক্ষী ও গুরুজনও তোমাদের কাছে তা-ই প্রত্যাশা করেন। এসো আমরা এখন এমন একজন ব্যক্তি সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা করি যিনি একটি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও সাধনাবলে তাঁর মেধার বিকাশ ঘটিয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, আবার একই সময়ে অধ্যাত্ম সাধনায় উৎকর্ষ লাভ করে বাংলাদেশ মণ্ডলীর ইতিহাসে একজন পবিত্র ব্যক্তি হিসেবে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। সেই ব্যক্তির নাম থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর শৈশব জীবন বর্ণনা করতে পারব;
- আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর যাজকীয় জীবন বর্ণনা দিতে পারব;
- বিশপ ও আর্চবিশপ হিসেবে বাংলাদেশ মণ্ডলীর ইতিহাসে গাঙ্গুলীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব;
- শিক্ষা বিস্তারে ও যুব গঠনে তাঁর অবদান বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মানবপরিবারের কল্যাণকাজে আগ্রহী হব।

ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী

পাঠ ১ : আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর জন্ম ও শৈশব

বিংশ শতকের শুরুর দিকে বাংলাদেশ খ্রীষ্টমণ্ডলীর ভাগ্যাকাশে এক নতুন নক্ষত্রের উদয় হয়। ঢাকা জেলার অন্তর্গত নবাবগঞ্জ থানার অধীন হাসনাবাদ গ্রামে একটি শিশুর জন্ম হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি নিকোলাস গমেজ ও রোমানা গমেজের পরিবারে তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান একটি ছেলের জন্ম হয়। জন্মের আট দিন পর ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁকে দীক্ষাস্নান সংস্কার দেওয়া হয় হাসনাবাদ জপমালা রাণীর গির্জায় এবং তাঁর নাম রাখা হয় থিওটোনিয়াস, ডাক নাম অমল। থিওটোনিয়াস অমলসহ নিকোলাস ও রোমানার তিন ছেলের মধ্যে অমল ছিল দ্বিতীয়। বড় ছেলের নাম জেভিয়ার ও ছোট ছেলের নাম বিমল। পরবর্তীতে পারিবারিক নাম পরিবর্তন করে তারা গাঙ্গুলী নাম গ্রহণ করেন।

অমলের বাবা-মা আদর করে তার থিওটোনিয়াস নামটিকে সংক্ষিপ্ত করে 'থেটন' বলে ডাকতেন। আবার তার ঠাকুরমা বালক বয়সে থিওটোনিয়াসের বুদ্ধির প্রখরতা দেখে আদরের সুরে নাতিকে ডাকতেন 'টেটন' বলে। দিনে দিনে ঠাকুরমার দেওয়া আদরের নামটির সার্থকতা প্রকাশ পেতে থাকে থিওটোনিয়াসের বুদ্ধিমত্তায়। শৈশবেই সবক্ষেত্রে, বিশেষ করে বিনম্র আচরণে ও পড়াশোনায় তার সাফল্য দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়।

নিকোলাস ও রোমানা তাঁদের তিনটি ছেলে সন্তান নিয়ে সুখেই দিন কাটাতেন। নিকোলাস চাকুরি করতেন কলকাতায়, আর তাঁর স্ত্রী রোমানা তিন ছেলে সন্তান ও শাশুড়িকে নিয়ে হাসনাবাদ গ্রামের বাড়িতে সুখে-শান্তিতেই ছিলেন। মা রোমানা সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে খুবই

২০২৬

যত্নবান ছিলেন। স্কুলের শিক্ষার পাশাপাশি তিনি সন্তানদের ধর্মীয়, নৈতিক ও মানবিক গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তারা তিন ভাই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং পিতা-মাতা ও গুরুজনদের প্রতি বাধ্য। তাঁরা সবাই তাদের বাড়ির অদূরে হলিক্রস ব্রাদারের দ্বারা পরিচালিত বান্দুরা হলিক্রস হাইস্কুলে লেখাপড়া করেছেন। মা রোমানা নিজে প্রতিদিন পবিত্র খ্রীষ্টযোগে যোগদান করতেন এবং ছেলেদেরও খ্রীষ্টযোগে যোগ দিতে উৎসাহ দিতেন। তারা সবাই মিলে পারিবারিক জপমালা প্রার্থনাও করতেন নিয়মিতভাবে। থিওটোনিয়াস হাসনাবাদ গির্জায় হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণ করেন ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুন তারিখে। এভাবে সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশে গুরুজনদের আদর যত্ন ও ভালোবাসা পেয়ে তিন ভাই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকেন। বড় ভাই জেভিয়ার বান্দুরা হলিক্রস হাইস্কুলে পড়াশোনা শেষ করে কলকাতায় তাঁর বাবার কাছে চলে যান। সেখানে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রি নিয়ে কলকাতায় প্র্যাকটিস্ শুরু করেন। ছোট ভাই বিমল বান্দুরা হলিক্রস স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করে কলেজে পড়ার জন্য ঢাকায় চলে যান।

কাজ : তোমার এলাকার এমন একটি আদর্শ পরিবারের বিষয়ে লেখো, যে পরিবার থেকে অন্তত একজন সন্তান ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে মণ্ডলীতে সেবা কাজ করছেন।

পাঠ ২ : সেমিনারিতে প্রবেশ ও যাজক পদে অভিষেক

প্রতিটি আদর্শ পরিবারে মা-বাবা সন্তানদের আদর-যত্ন দিয়ে লালনপালন করেন এবং তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখেন। নিকোলাস ও রোমানাও একইভাবে স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁদের তিনটি পুত্রসন্তানকে ঘিরে। তবে অমলকে নিয়ে তাঁদের স্বপ্ন ছিল একটু ভিন্নতর। সে যে প্রতিদিন খ্রিষ্টযাগে যোগদান করত এবং বেদীসেবকের কাজ করতে আগ্রহী ছিল তা দেখে তাঁরা খুব আনন্দ পেতেন। কেননা নিয়মিতভাবে খ্রিষ্টযাগে যোগদান করে যাজকের সান্নিধ্য পেলে তাদের কিশোর সন্তানের মধ্যে যাজক হবার ইচ্ছা জাগতে পারে—এই ছিল তাঁদের মনের একান্ত প্রত্যাশা। তাই অমলকে নিয়ে তাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং কল্পনা করেছিলেন যে, তাঁদের এই সন্তানটি একদিন যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হবে এবং মণ্ডলীর জন্য কাজ করবে। অচিরেই দেখা গেল অমলের ঝোঁক অনেকটা সেদিকেই।

হাসনাবাদ মিশন প্রাইমারি স্কুল থেকে তৃতীয় শ্রেণি পাস করে অমল বান্দুরা হলিক্রস হাইস্কুলে ভর্তি হন। অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী অমল বান্দুরা স্কুলে প্রতি শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করতেন। সপ্তম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা সেমিনারীতে প্রবেশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সেমিনারিতে প্রবেশ করতে হলে স্থানীয় পালক-পুরোহিতের বিশেষ সুপারিশের প্রয়োজন হয়। হাসনাবাদ পবিত্র জপমালা রাণী গির্জার পালক-পুরোহিত জানতেন যে, অমল নিয়মিত খ্রিষ্টযাগে যোগদান করে এবং বেদীসেবকের দায়িত্ব

পালন করে। তাই তিনি খুশি হয়ে অমলের সেমিনারীতে প্রবেশ করার জন্য জোর সুপারিশ করলেন। এভাবে মা-বাবার অনুমতি ও আশির্বাদ এবং পালক-পুরোহিতের সুপারিশ নিয়ে অমল ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারিতে যোগদান করেন। ক্ষুদ্রপুষ্পে সেমিনারি ও হলিক্রস হাইস্কুল পাশাপাশি অবস্থিত। স্কুলটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন হলিক্রস ব্রাদারগণ এবং সেমিনারির পরিচালক ছিলেন হলিক্রস যাজকগণ।

সেমিনারির ও স্কুলের ছাত্র হিসেবে অমলের শিক্ষা ও যাজকীয় জীবনে গঠন অত্যন্ত সুন্দরভাবে চলতে লাগল। সবার নিকট তিনি মেধাবী ও ভালো ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি তিনি স্কুলে ও সেমিনারিতে নাটকে অভিনয়, গান গাওয়া, ফুটবল ও হ্যান্ডবল খেলা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতেন এবং এগুলোতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এসব ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব এবং তাঁর অমায়িক চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি সবার নিকট সুপরিচিত ছিলেন। সেমিনারীর পরিচালক ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য ব্রাদারগণসহ সকল শিক্ষকও তাঁর মেধা, মননশীলতা ও সুন্দর আচরণে মুগ্ধ ছিলেন। সেমিনারির নিয়মকানুন পালনেও তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। তাঁর সততা, নম্রতা, বিনয় ও হাসিখুশি ভাব দেখে স্কুলের সহপাঠী ও অন্যান্য ছাত্ররা তাঁকে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব বলেই মনে করতো। সুনাম ও কৃতিত্বের সাথে পড়াশোনা করে অমল বান্দুরা হলিক্রস হাইস্কুল থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন (বর্তমান এসএসসি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

তৎকালীন পূর্ববঙ্গে বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারি ছাড়া যাজকীয় জীবনের প্রস্তুতিপর্বে পড়াশোনার জন্য অন্য কোন উচ্চতর সেমিনারি ছিল না। সুতরাং মণ্ডলী-কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে থিওটোনিয়াস অমলকে যাজকীয় অভিষেকের প্রস্তুতিপর্বে পড়াশোনা করার উদ্দেশ্যে উত্তর ভারতের রাঁচী শহরে সেন্ট আলবার্ট সেমিনারিতে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি দু'বছর জুনিওরেট কোর্সে পড়াশোনা করেন। এবং পরবর্তীতে উচ্চতর সেমিনারিতে ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত সেখানে তিনি ঐশতত্ত্ব পড়াশোনা করেন। সেখানেও বরাবরই তিনি সকলের নিকট অত্যন্ত মেধাবী, বিনয়ী, নম্র ঈশ্বরভক্ত ও প্রার্থনাশীল মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে অনেকেই তাঁকে তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে মনে করত। দীর্ঘ ছয় বছর রাঁচীর সেন্ট আলবার্ট সেমিনারিতে পড়াশোনা করার পর ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুন তারিখে মাত্র ২৬ বছর বয়সে থিওটোনিয়াস গাঙ্গুলী যাজকপদে অভিষিক্ত হন।

অভিষেক লাভ করার পর ফাদার থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী ঢাকায় ফিরে আসেন। তাঁর নিজ ধর্মপল্লি হাসনাবাদে তাঁকে অভ্যর্থনা দেওয়া হয়। অতঃপর তাকে বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারির সহকারী পরিচালক নিয়োগ করা হয় এবং তাকে সেমিনারীয়ানদের ধর্মীয় বিষয় শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি অতি আনন্দের সাথে সেই দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন করেন।

২০২৫

পাঠ ৩ : ফাদার গাঙ্গুলীর পবিত্র ক্রুশ সংঘে যোগদান

পবিত্র ক্রুশ সংঘের জন্ম হয়েছিল ফ্রান্স দেশে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই সংঘের সন্ন্যাসব্রতী যাজক, ব্রাদার ও সিস্টারগণ বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ববঙ্গে) এসেছিলেন ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। তখন থেকে তাঁরা এদেশে প্রৈরিতিক কাজ শুরু করেন। ক্রমান্বয়ে তাঁরা ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও সিলেট ধর্মপ্রদেশে খ্রীষ্টাদর্শ প্রচার করেন এবং অসংখ্য স্কুল, কলেজ ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ফাদার থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী ছোটবেলা থেকেই পবিত্র ক্রুশ সংঘের যাজক, ব্রাদার ও সিষ্টারদেরকে ধর্মপল্লিতে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাজ করতে দেখেছেন। তাঁদের নিবেদিত জীবন ও প্রৈরিতিক সেবাকাজ দেখেই তাঁর মনে যাজক হওয়ার ইচ্ছা জেগেছিল। মিশনারিদের ন্যায় তিনিও চেয়েছিলেন প্রভুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যাজক হয়ে প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করতে। তাছাড়াও অন্য একটি বিষয় তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল- পবিত্র ক্রুশ সংঘের সদস্য-সদস্যাদের সম্মিলিত সংঘবদ্ধ জীবন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের নিকট পবিত্র ক্রুশ সংঘে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেও তিনি অনুমতি পাননি। কেননা ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের সংখ্যাবৃদ্ধি করার ব্যাপারে মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ তখন সমধিক যত্নবান ছিলেন। সুতরাং তাঁকে বলা হয়েছিল যে, কেউ যদি যাজকীয় অভিষেক লাভের পর পবিত্র ক্রুশ সংঘে যোগ দিতে ইচ্ছা করে, তবে তাকে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

ফাদার গাঙ্গুলী এক বছর ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীতে দায়িত্ব পালন করার পর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ তাঁকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেন। সেখানে ফাদার থিওটোনিয়াস গাঙ্গুলী দর্শনশাস্ত্রের উপর পড়াশোনা করে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন।

এরপর ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে একই বিশ্বদ্যািলয় থেকে তিনি পিএইচডি ডিগ্রিও লাভ করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সময়ই তিনি পবিত্র ক্রুশ সন্ন্যাস-সংঘে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঢাকার আর্চবিশপের অনুমতি পাওয়ার পর ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে তিনি পবিত্র ক্রুশ সংঘের নভিশিয়েটে প্রবেশ করেন। অধ্যাত্ম-সাধনার মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণের পর ফাদার গাঙ্গুলী পবিত্র ক্রুশ সংঘের সংবিধান অনুসারে সন্ন্যাস-জীবনের অন্তরের অনাসক্তি, বাধ্যতা ও ক্যৌমার্য—এই তিনটি ব্রত গ্রহণ করে পবিত্র ক্রুশ সংঘভুক্ত হন। এরপর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

পাঠ ৪ : প্রেরণকর্মী ফাদার গাঙ্গুলীর কর্মজীবন

যীশু তাঁর যে শিষ্যদের বাণী প্রচার কাজে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের বলা হতো প্রেরিতশিষ্য বা প্রেরিতদূত। যীশু নির্দেশিত সেই কাজগুলো মণ্ডলী আজও চালিয়ে যাচ্ছে। প্রেরিত হয়ে কাজগুলো

করা হয় বলে তাকে বলে প্রেরণকর্ম। ফাদার গাঙ্গুলী যেসব প্রেরণকর্মে নিবেদিত ছিলেন তার কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো :

ক) শিক্ষক হিসাবে ফাদার গাঙ্গুলী : আমেরিকায় পড়াশোনা শেষ করে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ফাদার গাঙ্গুলীকে পুরনো ঢাকার লক্ষীবাজারে অবস্থিত সেন্ট গ্রেগরী কলেজে অধ্যাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২৬শে অক্টোবর সন্ধ্যায় কলেজ প্রাঙ্গণে তাঁকে সাড়ম্বর অভ্যর্থনা দেওয়া হয়। এরপর থেকেই তিনি কলেজে যুক্তিবিদ্যা পড়াতে শুরু করেন।

শিক্ষকতার কাজে ফাদার গাঙ্গুলী অনেক আনন্দ পেতেন। ছাত্রদের তিনি আন্তরিক ভালোবাসতেন। তিনি সব সময় পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে ক্লাসে আসতেন এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু অত্যন্ত সুন্দরভাবে ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর ছাত্রদের প্রতি ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা ও দরদবোধ। প্রত্যেক ছাত্রের নাম তাঁর মুখস্থ ছিল, সবাইকে তিনি নাম ধরেই ডাকতেন। এতে ছাত্ররা তাঁকে অত্যন্ত আপন ভাবত এবং তাঁকে অনেক শ্রদ্ধা করত। শিক্ষকতার পাশাপাশি ফাদার গাঙ্গুলী ছাত্রদের জন্য বিচিত্র ধরনের সহশিক্ষা কার্যক্রমের আয়োজন করতেন। ছাত্রদের জ্ঞানচর্চা যেন শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে সেই জন্য তিনি সৃজনশীল অনেক কর্মকাণ্ডে ছাত্রদের জড়িত করতেন। তাঁর উদ্যোগে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ আগষ্ট আর্চবিশপ গ্রেণারের প্রতিপালক সাধু লরেন্স-এর পার্বণ উপলক্ষে সেন্ট গ্রেগরী কলেজের ছাত্ররা একটি নাটিকা মঞ্চস্থ করে।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট গ্রেগরীজ কলেজটি লক্ষীবাজার থেকে ঢাকার মতিঝিলে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে কলেজের নতুন ভবন নির্মাণের কাজে ফাদার গাঙ্গুলী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। নতুন স্থানে এসে কলেজটির নাম পরিবর্তন করে নটর ডেম কলেজ রাখা হয়। এখানে ফাদার রিচার্ড টিম, সিএসসি বিভিন্ন কাজে, বিশেষ করে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ফাদার গাঙ্গুলীকে সাহায্য দিতেন। বিভিন্ন কাজে ফাদার গাঙ্গুলীর আগ্রহ ও দক্ষতা দেখে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর উপর কলেজের বেশ কিছু দায়িত্ব ছেড়ে দেন। কলেজে সংরক্ষিত রেকর্ড অনুসারে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ নাগাদ তিনি কলেজে যেসব দায়িত্ব পালন করছিলেন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো : (ক) শিক্ষা পরিচালক, (খ) ধর্মশিক্ষা-সংক্রান্ত পরিচালক, (গ) মারীয়ার সেনাসংঘের আধ্যাত্মিক পরিচালক এবং বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বুলেটিন 'মুকুর'– এর সম্পাদক ও প্রকাশক, এবং (ঘ) হলিক্রস ফাদারদের হাউস কাউন্সিলের সদস্য। তাছাড়া, এ সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ম্যাট্রিকুলেশন ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় লাতিন ভাষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দায়িত্বও তিনি পালন করেন।

কলেজের উপাধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষ হিসাবে ফাদার গাঙ্গুলী

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১ নভেম্বর তারিখে ফাদার গাঙ্গুলীকে নটর ডেম কলেজের অস্থায়ী উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। পাশাপাশি তাঁকে কলেজে কর্মরত সিএসসি ফাদারের সহকারী সুপিরিয়রের দায়িত্ব এবং

কলেজে প্রধান নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তী বছর তাঁকে কলেজের 'হার্ভেস্ট' নামক একটি ম্যাগাজিন প্রকাশনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এসব দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন এবং তাঁর মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে স্থায়ীভাবে কলেজের উপাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়। অতঃপর ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল তাঁকে অস্থায়ীভাবে এবং ৩০ এপ্রিল স্থায়ীভাবে অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ফাদার গাঙ্গুলীই হলেন স্বনামধন্য নটর ডেম কলেজের প্রথম দেশীয় অধ্যক্ষ।

পালক হিসেবে ফাদার গাঙ্গুলী

নটর ডেম কলেজে সাপ্তাহিক ছুটি ছিল দু দিন : শনিবার ও রবিবার। কলেজের রুটিনমাফিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে এবং ছুটির দিনে ফাদার গাঙ্গুলীসহ কলেজে কর্মরত অন্যান্য ফাদারগণ মণ্ডলীর বিভিন্ন পালকীয় কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখতেন। বিভিন্ন ধর্মপল্লিতে পালক-পুরোহিতদের পালকীয় কাজে সাহায্য দিতেন। বড়দিন বা ইষ্টারের আগে স্থানীয় ধর্মপল্লিতে পাপ স্বীকার সংস্কার প্রদান, স্থানীয় জনগণের জন্য এবং ব্রতধারীদের, ক্যাটেখীষ্ট ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য নির্জনধ্যান ও সেমিনার পরিচালনা, ইত্যাদি কাজেও সাহায্য দিতেন। ফাদার গাঙ্গুলী এসব কাজে যেমন পারদর্শী ছিলেন, তেমনি তাঁর বিজ্ঞ উপস্থাপনার জন্য সমধিক জনপ্রিয় ছিলেন। আজকালকার ন্যায় সে যুগে রাস্তাঘাট তেমন ছিল না, অধিকাংশ সময় পায়ে হেঁটে, না হয় ঘোড়ায় চড়ে বা সাইকেলে যাতায়াত করতে হতো। অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও ফাদার গাঙ্গুলী আনন্দ সহকারে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে এসব পালকীয় কাজ করতেন।

যুবগঠন কাজে ফাদার গাঙ্গুলীর অবদান

ফাদার গাঙ্গুলী পালকীয় কাজে আনন্দ পেতেন, তাই এসব কাজের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারতেন। নটর ডেম কলেজের ছাত্রদেরকে শ্রেণিকক্ষে পড়ানো ছাড়াও সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে তাদের তিনি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতেন। বিভিন্ন সময়ে নানা সমস্যা সমাধানে কাউন্সেলিং বা পরামর্শ দিয়ে ছাত্র ও তাদের অভিভাবকদের সহায়তা করতেন। যুবক-যুবতীরাই যে সমাজ ও মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ এবং সেহেতু তাদের বিশেষ যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন তা তিনি সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন।

ফাদার গাঙ্গুলী ছাত্র ও যুবকদের বোঝাতে চেষ্টা করতেন কীভাবে তাদের নৈতিক চরিত্র মজবুত ও শক্তিশালী করা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে যারা সমস্যাগ্রস্ত হয়ে পড়ত তাদেরকে সহায়তা করার জন্য তিনি সব সময়ই তাদের পিতামাতা ও অভিভাবকদের সময় দিতেন। তিনি ধৈর্য সহকারে তাদের কথা শুনতেন এবং দিকনির্দেশনা দিতেন। কলেজ হোস্টেলের ছাত্রদের জন্য তিনি নির্জনধ্যান পরিচালনা করতেন এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর কন্‌ফারেন্স বা ধর্মভাষণ দিতেন। যুবক-যুবতীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গঠনকাজে সহায়তা করার জন্য নিজ উদ্যোগে তিনি একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর রমনা সেন্ট মেরীজ ক্যাথিড্রালে অনুষ্ঠিত ধর্মপ্রদেশীয় পালক-পুরোহিতদের আলোচনা সভায় প্রস্তাব আকারে পেশ করেছিলেন। এসব প্রস্তাব বাস্তবায়ন করার বিষয় নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছিল যার ফলে ধর্মপ্রদেশে যুব সংগঠন কার্যক্রমে গতি সঞ্চারিত হয়েছিল।

পাঠ ৫ : প্রথমে বিশপ ও পরবর্তীতে আর্চবিশপ পদে গাঙ্গুলী

নটর ডেম কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র চার দিন পর, ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর, পোপ ত্রয়োবিংশ যোহনের প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে ফাদার গাঙ্গুলী জানতে পারলেন যে, তাঁকে বিশপ পদের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। খবরটি দ্রুত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। একজন বাঙালি এই প্রথম বিশপ পদে মনোনীত হয়েছেন শুনে সর্বত্র আনন্দের বন্যা বয়ে যেতে শুরু করলো। অবশ্য খবরটি অপ্রত্যাশিত ছিল না। ফাদার গাঙ্গুলীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, অসাধারণ চারিত্রিক গুণাবিলি, কর্মক্ষেত্রে ও প্রশাসনিক কাজে দক্ষতা, অমায়িক আচরণ, সুগভীর আধ্যাত্মিকতা, পালকীয় কাজে আগ্রহ-উদ্দীপনা ইত্যাদি লক্ষ্য করে অনেকেই অনুমান করেছিল যে, ফাদার গাঙ্গুলীর উপর মণ্ডলীর আরও দায়িত্ব আসতে পারে। সুতরাং যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য স্থানে দেখে সবাই ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানালো।

ফাদার গাঙ্গুলীর বিশপ পদে মনোনীত হওয়ার শুভ বার্তাটি রোমের অবজারভাতোরে রোমানো-তে এবং পাকিস্তান অভজারভার এ প্রকাশিত হলো। সেখানে আরও জানানো হলো যে, রোম থেকে কার্ডিনাল আগাজিনিয়ান স্বয়ং ঢাকায় এসে অক্টোবরের ৭ তারিখে থিওটোনিয়াস গাঙ্গুলীকে বিশপ পদে অভিষিক্ত করবেন। অভিষেকের দিন রমনা ক্যাথিড্রালে দেশ-বিদেশের অসংখ্য খ্রীষ্টভক্ত, যাজক, ব্রাদার, সিস্টার ও অন্যান্য অতিথিদের সমাগম হলো। সাড়ম্বরে সম্পন্ন হলো বিশপীয় অভিষেক অনুষ্ঠান।

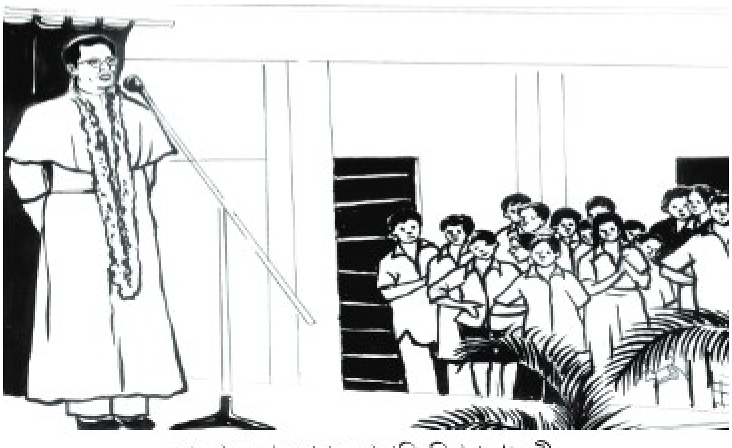

বাংলাদেশের প্রথম বাঙালি বিশপ গাঙ্গুলী

বাংলাদেশের প্রথম বাঙালি বিশপ গাঙ্গুলী

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সকল ধর্মপল্লি এবং নটরডেম কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নব অভিষিক্ত গাঙ্গুলীকে অভ্যর্থনা জানানো হলো। অতঃপর তিনি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে শুরু করলেন। এ সময় ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল ইত্যাদি এলাকার মান্দিদের উপর নানা রকম অত্যাচার শুরু হয়। এর প্রতিবাদ জানিয়ে আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেনর, সিএসসি পাকিস্তান সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে পাকিস্তান সরকার আর্চবিশপ গ্রেনারের ভিসা নবায়ন বন্ধ করে দেন এবং ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁকে পাকিস্তান থেকে চলে যেতে বাধ্য করেন।

আর্চবিশপ পদে গাঙ্গুলী

আর্চবিশপ গ্রেনার পাকিস্তান থেকে চলে গেলেও তিনি আশাবাদী ছিলেন যে পাকিস্তান সরকার তাঁকে ফিরে আসার সুযোগ দেবেন। তাই পোপ মহোদয় তাঁকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন ঢাকার আর্চবিশপের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ না করেন। ইত্যবসরে উত্তরসূরি আর্চবিশপ গাঙ্গুলী ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। অবশেষে আর্চবিশপ গ্রেনারের আর এদেশে ফেরার সম্ভাবনা না থাকাতে তিনি ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩ নভেম্বর পোপ মহোদয়ের নিকট তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দেন। সেদিন থেকেই আর্চবিশপ গাঙ্গুলী ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের স্থায়ী আর্চবিশপ পদে বহাল হন। তবে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলো ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ২১ জানুয়ারি তারিখে। তাঁর দক্ষ পরিচালনায় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে স্থানীয় মণ্ডলীর নতুন জাগরণ ও যাত্রা শুরু হলো। সেই জাগরণ নানাভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করল। স্থানীয় আহ্বানের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে স্থানীয় মণ্ডলী অনেক দিক দিয়েই এগিয়ে গেল।

এদেশে বহু বছর ধরে মণ্ডলীর পরিচালনায় ছিলেন বিদেশি মিশনারিগণ। এখানকার মণ্ডলী প্রতিষ্ঠায় তাদের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার পরবর্তী সময়ে, বিশেষ করে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে দেশ স্বাধীন হবার পর স্থানীয় মণ্ডলীর প্রত্যাশা ও প্রয়োজন অনেক বেশি অনুভূত হতে শুরু করে। এর প্রেক্ষাপটেই স্থানীয় মণ্ডলীর অগ্রযাত্রায় স্থানীয় আর্চবিশপের ভূমিকা অধিকতর চ্যালেঞ্জপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি অতিশয় সহজ সরল ও নরম স্বভাবের মানুষ ছিলেন বলে কাউকে তিনি আঘাত দিতে পারতেন না। কারো সাথে রাগও করতে পারতেন না। পক্ষান্তরে তিনি এমনকি বিরূপ সমালোচনাকেও নীরবে সহ্য করতেন। এই কারণে অনেকে তাঁকে দুর্বল মনে করতেন এবং দলাদলি সৃষ্টি করে তাঁর মনে কষ্ট দিতেন।

পাঠ ৬: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর ভূমিকা

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে দেশপ্রেমিক সকল নাগরিকই গর্ববোধ করে। মুক্তি যুদ্ধের সময়, জাতির সংকটকালে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে নয় মাসব্যাপী তুমুল যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে সত্য, কিন্তু এর জন্য জাতিকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। নিরস্ত্র লক্ষ লক্ষ বাঙালি পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে, আবার পাকিস্তান হানাদারবাহিনীর অত্যাচারের শিকার হয়ে, সহায়-সম্বল হারিয়ে পথের ভিখারি হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের উপর পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর হত্যা, লুটপাট, ধর্ষণ ও অমানুষিক নির্যাতনের ফলে অনেকেই শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এরূপ সংকটময় মুহূর্তে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী বাংলাদেশের সকল যাজক, ব্রাদার ও সিস্টারদের একটি জরুরি পরিপত্র পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন — যেন সবাই সাধ্যমতো শরণার্থী বিপন্ন মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং তাদের কষ্ট লাঘব করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

আর্চবিশপ গাঙ্গুলী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তান সরকারকে পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র জনগণের উপর অত্যাচার-নির্যাতন বন্ধ করার আবেদন জানানোর জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাতে উল্টো প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন। পোপ ৬ষ্ঠ পলের নির্দেশ অনুযায়ী আর্চবিশপ গাঙ্গুলী পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত জঘন্য অপরাধের জন্য সকলকে অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত করার আহ্বান জানিয়ে সকল ধর্মপল্লির যাজকদের নিকট পত্র দিয়েছিলেন। আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর নির্দেশ অনুযায়ী অনেক মিশনে শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল, আহতদের জন্য চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয়েছিল।

পঞ্চম বিশ্বশান্তি দিবস উপলক্ষ্যে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী কর্তৃক ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২ জানুয়ারি মণ্ডলীর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে যৌথভাবে সংবর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে দেশের বেশ কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি, মন্ত্রীপরিষদের সদস্য ও সেনাকর্মকর্তা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার আর এন মিস্রাসহ বেশ কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস গাঙ্গুলী তাদের সংবর্ধনা প্রদান করেন এবং পঞ্চম বিশ্বশান্তি দিবসকে কেন্দ্র করে একটি লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। উক্ত লিখিত বক্তব্যে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী বলেন, "গভীর সম্মান ও কৃতজ্ঞতাভরা অন্তরে আমি ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং আমাদের মুক্তিবাহিনীর জওয়ানদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। কারণ আপনারা আমাদের বাংলাদেশে স্বস্তি ও শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই আজ আনন্দে আপ্লুত হয়ে আপনাদেরকে আমরা আমাদের মাঝে অতিথি হিসেবে বরণ করে নিচ্ছি; যাঁরা আমাদের দেশে ন্যায্যতা ও শান্তি আনয়নের জন্য অকাতরে জীবন দান করেছেন, আমরা কী করে আজ তাঁদের ভুলে থাকি? আমাদের সবিনয় প্রার্থনা, কৃপাময় পরমেশ্বর তাঁদেরকে যোগ্য পুরস্কারে ভূষিত করুন।" ২০২৫

পাঠ ৭: অনন্তের পথে যাত্রা

প্রভুর বিনম্র সেবক, নিরলস কর্মী, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের প্রথম দেশীয় বিশপ ও পরবর্তীতে আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস গাঙ্গুলী ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর তারিখে বিকেল আনুমানিক ৪টার দিকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর্চবিশপ হাউসে সে সময় উপস্থিত ছিলেন সিস্টার প্রজ্ঞা, এসএমআরএ এবং ফাদার চার্লস গিলেসপি, সিএসসি। আর্চবিশপ গাঙ্গুলী বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করাতে সিস্টার প্রজ্ঞা ও ফাদার সিলেসপি তাঁকে গাড়িতে তুলে মগবাজার ডাক্তার জামানের ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য রওনা দেন। সেখানে পৌঁছে গাড়ি থেকে তাঁকে নামানোর আগেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কর্তব্যরত ডাক্তার পরীক্ষা করে জানান আর্চবিশপ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর মৃত্যুতে সারা দেশের খ্রীষ্টান সমাজের উপর শোকের ছায়া নেমে আসে। অবিলম্বে সকল ধর্মপ্রদেশের বিশপগণ ঢাকায় আসতে শুরু করেন। অগণিত ভক্তসাধারণও তাদের প্রিয় আর্চবিশপকে চিরবিদায় জানানোর আগে একনজর দেখার জন্য ঢাকায় এসে জড়ো হন। পরদিন ৩ সেপ্টেম্বর তারিখে শেষকৃত্য মহাখ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করা হয় রমনা ক্যাথিড্রালে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন তৎকালীন খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপ মাইকেল অতুল ডি'রোজারিও, সিএসসি এবং খ্রীষ্টযাগে ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন ফাদার টমাস জিমারম্যান, সিএসসি। তারপর আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর মরদেহ রমনা আর্চবিশপ ভবনের সামনের চত্বরে সমাধিস্থ করা হয়।

পাঠ ৮ : ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ গাঙ্গুলী

বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রথম দেশীয় (বাঙালি) বিশপ এবং পরবর্তীতে আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, সিএসসি পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও ছিলেন শিশুর মতো সরল ও নম্র। পর্বতের উপরে প্রদত্ত উপদেশে যীশু যাদেরকে ধন্য বা সুখী বলেছেন সেরূপ মানুষই ছিলেন তিনি। একজন মানুষ হিসেবে, একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে, একজন যাজক হিসেবে, মণ্ডলীর একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসেবে তিনি ছিলেন সফল ও সার্থক। অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কোনো অহংবোধ ছিল না। পক্ষান্তরে তিনি ছিলেন অন্তরে দীনদরিদ্র, কোমলপ্রাণ, নম্রবিনীত, ন্যায়পরায়ণ, ধার্মিক, দয়ালু, শুদ্ধচিত্ত, বিবেকবান, শান্তির সাধক ও ধর্মময়তার জন্য তৃষিত মানুষ। তিনি ছিলেন সমস্ত লোভ-লালসার উর্ধ্বে। তিনি ছিলেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রিয়। যে কেউ একবার তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছে সে তাঁর বিষয়ে জীবন্ত সাক্ষী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বাস ও শিক্ষা অনুসারে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাঁকে ধন্য বা সাধু বলে আখ্যা দেওয়া হয়। সেই রীতি অনুযায়ী কাথলিক মণ্ডলী প্রয়াত আর্চবিশপ গাঙ্গুলীকে ধন্য বা সাধু শ্রেণিভুক্তকরণের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে তাঁকে "ঈশ্বরের সেবক" সম্মানসূচক

উপাধিতে ভূষিত করেছেন। অদূর ভবিষ্যতে তিনি হয়তো সাধুশ্রেণিভুক্ত হবেন। সারা বছর, বিশেষ করে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শত-সহস্র ভক্ত তাঁর সমাধিস্থলে ভিড় জমান। তাঁরা তাঁর জন্য প্রার্থনা না করে বরং তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানান। দিনে দিনে তাঁর প্রতি ভক্তবিশ্বাসীদের শ্রদ্ধা-ভক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের প্রাক্তন আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা জনগণের অনুরোধে পোপ মহোদয়ের সাধু-সন্তবিষয়ক সংস্থার কাছে তুলে ধরে প্রয়াত আর্চবিশপ গাঙ্গুলীকে সাধু শ্রেণিভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করার আবেদন জানালে রোমের পবিত্র দপ্তর ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর, আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর ২৯তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে "ঈশ্বরের সেবক" উপাধি প্রদান করেন। এদিনে "ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ গাঙ্গুলী'র ধন্য শ্রেণিভুক্তকরণের উদ্দেশ্যে একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। এই কমিটিকে তাঁর ধন্যশ্রেণিভুক্ত হওয়ার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমাদের প্রার্থনা, ঈশ্বর তাঁর এই বিনম্র ভক্তসাধককে স্বর্গে ও পৃথিবীতে সর্বত্র মহিমান্বিত করুন।

প্রয়াত আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর প্রতি বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের চিহ্নস্বরূপ ইতোমধ্যে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছে তাঁর নাম অনুসারে। যেমন, নটর ডেম কলেজে ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ৬-তলা বিশিষ্ট ভবনের নামকরণ করা হয়েছে "গাঙ্গুলী ভবন", ২০০৯ খ্রীষ্টাব্দে মোহাম্মদপুর সেন্ট যোসেফ স্কুল প্রাঙ্গণে কাথলিক মণ্ডলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত একমাত্র টিচার্স ট্রেনিং কলেজটির নামকরণ করা হয়েছে "আর্চবিশপ টি,এ, গাঙ্গুলী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো

১. থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেন ... খ্রীষ্টাব্দে।

২. সেমিনারীতে প্রবেশ করতে হলে স্থানীয় পালক পুরোহিতের বিশেষ ... প্রয়োজন ছিল।

৩. যীশু তাঁর যে শিষ্যদের বাণী প্রচার কাজে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের বলা হতো ... ।

৪. প্রেরিত শিষ্যদের মতো ফাদার গাঙ্গুলীও ছিলেন একজন ... ।

৫. নটর ডেম কলেজের শুরু থেকে ফাদার ... জড়িত ছিলেন।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ঈশ্বর থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে	• মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ খুব যত্নবান ছিলেন
২. দেশীয় যাজকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য	• মণ্ডলীর প্রধান করে পাঠালেন
৩. ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা সেমিনারীতে প্রবেশ	• ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে
৪. মণ্ডলীর কাজগুলো হলো	• প্রেরণকর্ম
৫. আর্চবিশপ গাঙ্গুলী বাঙালিদের মধ্যে	• প্রথম বিশপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আর্চবিশপ গাঙ্গুলী কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

ক. ১৯১৮ খ. ১৯২০

গ. ১৯২১ ঘ. ১৯২২

২. মণ্ডলী আর্চবিশপ গাঙ্গুলীকে 'ঈশ্বরের সেবক' উপাধি দেওয়ার কারণ কী?

ক. ভালোবাসা খ. দূরদর্শিতা

গ. মায়া মমতা ঘ. বিশ্বস্ততা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সুমন মেধাবী ছাত্র। ছোটবেলা থেকেই তার লেখাপড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ। সে নিয়মিত স্কুলে যায়। শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ সঠিক সময়ে করে। স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান, অভিনয়, নাটক, উপস্থিত বক্তৃতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। স্কুলের ও পরিবারের সব কাজকর্ম যথাসময়ে করে থাকে এবং অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করে।

৩. সুমনের মধ্যে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা হলো—

i. শৃঙ্খলাবোধ

ii. দূরদর্শিতা

iii. সহযোগিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

৪। সুমনের গুণের দ্বারা সে হয়ে উঠতে পারে—

ক. জীবনে প্রতিষ্ঠিত খ. বন্ধুভাবাপন্ন

গ. আলোচনার পাত্র ঘ. করুণার পাত্র

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সেরন একজন সমাজকর্মী। তিনি পঞ্চগড় জেলায় গিয়ে লক্ষ করলেন যে, সেখানকার ১৫-২৩ বছর বয়সী নারী-পুরুষেরা বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করে। গির্জার প্রার্থনা বা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেয় না। নেশা, ধূমপান, হাসি-তামাশা, চাঁদাবাজি, কলহ-বিবাদ ইত্যাদি তাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এদের উন্নতির জন্য তিনি একটি 'সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছেলেমেয়েদের নৈতিক উন্নতির জন্য প্রতি মাসে সেমিনারের আয়োজন করেন এবং তাদের গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা, পারিবারিক প্রার্থনা, ধ্যান ও নির্জন ধ্যানের ফল সম্পর্কে শিক্ষা দেন।

মাঝে মাঝে তিনি নির্জন ধ্যানের ব্যবস্থাও করে থাকেন। এতে ছেলেমেয়েরা সঠিক জীবনের পথ খুঁজে পায়।

ক. বাংলাদেশের প্রথম বাঙালি আর্চবিশপ কে?

খ. আর্চবিশপ গ্রেনার স্বদেশে ফিরে গিয়েছিলেন কেন?

গ. সেরন টি.এ গাঙ্গুলীর কোন কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজগুলো করেছিল?

ঘ. সেরন ও টি.এ গাঙ্গুলীর কাজের তুলনামূলক আলোচনা করো।

২. দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেন জন। ছোটবেলা থেকেই তিনি সংগ্রাম করে বড় হয়েছেন। প্রচুর মেধা ও প্রতিভা ছিল তাঁর মধ্যে। শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হয়ে শিক্ষার্থীদের অনেক অনুপ্রেরণা ও সাহায্য সহযোগিতা দিয়েছেন। এরপর তিনি 'কল্যাণ সংঘ' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সংঘের মূল লক্ষ্য ছিল দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা, সাহায্য এবং ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা। এ কাজের পাশাপাশি তিনি সাধারণ মানুষের মাঝে ধর্মপ্রচার করেন। এতে যুবক-যুবতী ও নারী-পুরুষ প্রত্যেকেই উপকৃত হয়। তার এ কাজে খুশি ও একমত হয়ে খ্রীষ্টান সমাজের প্রত্যেকেই তাকে 'খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ'–এর প্রধান মনোনীত করে দেয়।

ক. কত সালে ফাদার গাঙ্গুলীকে নটর ডেম কলেজের স্থায়ী অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়?

খ. প্রতিকূল আবহাওয়া ফাদার গাঙ্গুলীকে দমিয়ে রাখতে পারেনি কেন?

গ. ফাদার গাঙ্গুলীর কোন দিকটি শিক্ষক জনের মধ্যে লক্ষ করা যায়– ব্যাখ্যা করো।

ঘ. খ্রীষ্টমণ্ডলী জনের মধ্যেই টিএ গাঙ্গুলীকে দেখতে পায়—উক্তিটির সাথে কি তুমি একমত? তোমার মতামত দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মণ্ডলী বিশপ থিওটোনিয়াসকে কেন 'ঈশ্বরের সেবক' উপাধি দিয়েছে?

২. আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর শৈশব জীবন সম্পর্কে লেখো।

৩. আর্চবিশপ গ্রেনারকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয় কেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ফাদার গাঙ্গুলী কীভাবে পবিত্র ক্রুশ সংঘে যোগদান করলেন? বর্ণনা করো।

২. শিক্ষা বিস্তার ও যুব গঠনে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর অবদান বর্ণনা করো।

৩. মুক্তিযুদ্ধে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর ভূমিকা লিপিবদ্ধ করো।

সমাপ্ত

২০২৫

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

অষ্টম-খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

অন্তরে যারা পবিত্র-ধন্য তারা।

-বাইবেল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।